বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 623. July, 1915.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬২৩ সংখ্যা। { আষাঢ়, ১৩২২। জুলাই, ১৯১৫। } ১০ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

মনীষা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২)

তাহার পর কয় দিন কাটিয়াছে, মনীষা খুব গম্ভীর হইয়া শয়ন-কক্ষের একটা কোণে বোনা, সেলাই ও পড়া লইয়া অত্যন্ত নিরীহভাবে দিন কাটাইতেছে। নিতান্ত আবশ্যক ব্যতীত কাহারও সহিত বড় একটা কথা কহে না, সংসারের সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান পুরাণ ঝিই সব করে, কেবল অতি প্রয়োজনীয় দুই একটা কায, যাহা না করিলেই নয়, তাহাই যথাসাধ্য সংক্ষেপে মনীষা সারিয়া থাকে।

মহেন্দ্রনাথও বাহিরে বৈঠকখানায় বন্ধুদিগকে লইয়া হাবাবড়ের মধ্যে খুব জমিয়া গিয়াছেন। মনীষার আকস্মিক আবির্ভূত ঔদাসীন্যটা তিনি যেন খুব উপেক্ষার সহিতই এক পাশে ঠেলিয়া রাখিয়া নিজের দিনগুলা প্রচুর স্বচ্ছলতার মধ্য দিয়া নিরুদ্বেগে কাটাইয়া দিবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত। সংসারের ছোট খাট খুঁটি নাটী গুলা যেন নিতান্তই অগ্রাহ্যের সহিত এড়াইয়া যাওয়াই তাঁহার একমাত্র কাজ। এইরূপ ভাব দেখাইয়া তিনি খুবই স্বতন্ত্র হইয়া দিন কাটাইতেছেন।

কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের ঠেলায় দীনু দুবের দিনগুলা কেমন অসহ্য নিরানন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে। সে আজ ছয় মাস মনীষার কাছে রহিয়াছে, কই কেহত একদিনের জন্য—এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহার স্বাধীন আনন্দে হস্তক্ষেপ করে নাই! তবে একি হইল? কার অভিশাপে এ দুর্দ্দৈব ঘটিল? আগে ত সে কত দুষ্টামী করিয়া বিনা দণ্ডে পরিত্রাণ পাইয়াছে, মনীষার আদেশে কাহারও

কিছু ফরমাস খাটিতে গিয়া যখন সে পথে খেলিয়া, প্রচুর বিলম্ব করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে এবং তিরস্কারোদ্যতা মনীষাকে যখন কল্পিত কৈফিয়ৎ বাৎলাইতে গিয়া হাসাইয়া দিয়াছে, কই তখন ত কেহ তাহাকে কিছুই বলে নাই। তবে এখন অকারণ কেন এমন অবস্থান্তর ঘটিল? এই যে সে বিনা প্রয়োজনে সমস্ত দিনটা হেথা হোথা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—তা বিনাক্ষে মনীষা একবার ডাকিয়া শুধাইতেও ভুলিয়া গিয়াছেন, এ কি কম আক্ষেপ? অভিমানে সময় সময় তাহার চক্ষু ছাপাইয়া জল আসিত, না, সে এত বরদাস্ত করিতে পারে না, মাইজীর এ নীরব গাম্ভীর্য্য—সমস্ত বিশ্বছন্দটাকে যেন বেসুর করিয়া তুলিয়াছে, সে কি করিয়া সামলাইয়া থাকে বলুন তো!

সে দিন মিশরাইন (মিশ্রাণী) ঠাকুরাণীর প্রাঙ্গণের টগর-গাছটীতে প্রচুর পরিমাণে টগর ফুটিয়াছে দেখিয়া তাহার মাথায় একটা চমৎকার মতলব খেলাইল! সে মিশরাইনের ছোট মেয়েটীকে কতকগুলো সিগারেটের ছবি ঘুস দিয়া গাছ উজাড় করিয়া ফুলগুলি তুলিল। তারপর কলা-বাসনার সুতা সংগ্রহ করিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত, বহুক্ষণব্যাপী ধৈর্য্য সহকারে এক ছড়া মালা গাঁথিল, এবং তাহার মাঝখানে একটী সদ্যপ্রস্ফুটিত টকটকে রাঙা জবা ফুলের খুপী ঝুলাইয়া অত্যন্ত খুশী হইয়া গর্ব্বভরে সেটাকে বারবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া, অবশেষে সাহসে ভর করিয়া আসিয়া মনীষার ঘরে ঢুকিল।

মনীষা তখন জানালার কাছে বসিয়া ছাঁটা ফুলের আসন ছাঁটিতেছিল, পদশব্দে মুখ তুলিয়া চাহিল, দীনুকে দেখিয়া তখনই তাহা নাবাইয়া আবার হাতের কাঁচির দিকে মন দিল। ইহারা সবাই খেপিয়াছে এবং তাহাকেও খেপাইয়া তুলিবার যোগাড় করিতেছে,—না, সে আর কাহাকেও প্রশ্রয় দিবে না। বিশ্বের সহিত তাহার সম্পর্ক কি?

মনীষার উদাসীন দৃষ্টি দেখিয়া নিমিষে দীনুর সকল উৎসাহ নিভিয়া গেল, মনীষার নিকট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবার তাহার আর ভরসা হইল না। একটু ইতস্তত করিয়া অবশেষে টেবিলের ফুলদান হইতে শুষ্ক ফুলগুলা ঝাড়িয়া ফেলিয়া তাহাতেই মালাটা সুবিন্যস্ত করিয়া ধবধবে সাদা ফুলগুলির মাঝখানে পদ্মরাগ মণির মত লাল জবাটা পরিপাটীরূপে সাজাইল।

তথাপি মনীষা কোন কথা কহিল না দেখিয়া ক্ষুণ্ণমনে সিগারেটের খালি বাক্স খুঁজিবার ছলে এদিক ওদিক ঘুরিয়া দীনু মনীষার নিকটে আসিয়া, মাটির উপর দুহাতে ভর দিয়া জানু পাতিয়া বসিল, এবং কষ্ট-বিকসিত হাসি-মুখে একটু 'হলুদি' পশম প্রার্থনা করিল।

মনীষা পশমের বাক্স হইতে একটা ছোটগুলি তুলিয়া মেঝের ফেলিয়া দিয়া বলিল "নিয়ে যা"—

দীনু তৎক্ষণাৎ সেটা কুড়াইয়া লইল, কিন্তু যাইবার কোন লক্ষণ না দেখাইয়া উল্টা চাপিয়া বসিল, এবং আপন মনেই মনীষাকে ধীরে ধীরে শুনাইয়া দিল যে, শিবু কুর্ম্মির ছোট ছেলেটা, নীলমনিয়া (নিউমোনিয়া) বেমারে মর মর হইয়াছে, ডাক্তার দেখাইতে আজ হাঁসপাতালে লইয়া গিয়াছে, পাড়ার সকল লোকেরা বলিতেছে আর বাঁচিবে না।—

মুহূর্ত্তমধ্যে মনীষা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল! সে কি যত বাজে লোকের সংবাদ বহিয়া আনিবার জন্ত এই ছোঁড়াটাকে বাহাল করিয়াছে? না তাহাকে বিদ্রোহিতায় মাতাইবার জন্ত ইহাকে মন্ত্র পড়িতে ডাকিয়াছে,—সে মুন্সেফের স্ত্রী, মুন্সেফ-পত্নীর মতই—সাধারণের নিকট হইতে সুদূরে পৃথক্ থাকিবে, না হইলে তাহার নিজের সম্ভ্রম যত থাক না থাক, আর পাঁচজন শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির যে ভয়ানক অপমান করা হইবে! অতএব— মনীষা আরক্তমুখে বলিল "তা হয়েছে হয়েছে, আমি কি করব? আমি কি পীর না পয়গম্বর যে, হুকুমে রোগ আরাম করব?........."

দীনু স্তব্ধনয়নে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল? মাইজীকে এমন কথা শিখাইল কে?......

অপ্রস্তুত বালক খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া তারপর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল! মনীষা তখন কাঁচি ও কার্পেট ফেলিয়া দুই হাতে কপাল চাপিয়া একখানা বই পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল।

(৩)

উজ্জ্বল ফিকে ফিকে রাঙ্গা মেঘে আকাশের চারিদিক রাঙিয়া উঠিয়াছে। ঈশান কোণে একখানা কাল মেঘ উঠিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। চারিদিকের গাছপালা গুলা সব স্তব্ধ ভাবে আঁকা ছবির মত স্থির হইয়া আছে। গোটাকতক আহারলুব্ধ পক্ষী কেবল চঞ্চল ভাবে আকাশের কোলে ঘুরিতেছিল।

মহেন্দ্রনাথ কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছেন। মনীষা একা দ্বিতলের বারেন্দায় অন্যমনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার এই কর্ম্মহীন সন্ধ্যা সকাল গুলো যেন দিনে দিনে অত্যন্ত অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। মনটা কেবলই বাঁধন ছিঁড়িয়া কোন একটা নিরুদ্দেশের উদ্দেশে ছুটিবার জন্ত সময় সময় বড়ই অধীর হইয়া উঠে। তাহার দিন রাত যেন আর কাটে না, বিশেষতঃ ঐ বৈকালবেলা!—সমস্ত কায কর্ম্ম সারা হইলে প্রাণটা কেবলই হু হু করিয়া উঠে—তাইত! এবার কি করি!

তাহার কায নাই, ক্লান্তি নাই, স্ফূর্ত্তি নাই, আছে শুধু চারি দিক আচ্ছন্ন করিয়া একটা গুরুভার অবসাদ। প্রতি মুহূর্ত্ত সে যে কি অস্বস্তিতে কাটাইতেছে, তাহা বলিবার নহে,—কিন্তু আর এ রকমে সময় কাটে না।

ঈশান কোণের মেঘখানা ক্রমশঃ ঘোরাল হইয়া চারিদিকের আকাশের সমস্ত বর্ণ-বৈচিত্র্যের উপর একটা নিষ্ঠুর কাল যবনিকা টানিয়া দিল। আসন্ন বর্ষণোন্মুখ সজল বায়ু বহিতে আরম্ভ হইল, জল নামে বুঝি!

মনীষা আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শেষে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। আহা তিন বৎসর পূর্ব্বে এমনি একটা মেঘাচ্ছন্ন বর্ষণশীল সন্ধ্যার সময় তাহার কিশোর জীবনের সেই একমাত্র স্নেহের পুতুলটী কোন একটা অনির্দ্দিষ্ট রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে!—ঠিক সে আজ তিন বৎসর!

মনীষার দুই চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল, আজ কোথায়—আজ কোথায় তাহার সেই স্বর্গ পারিজাত সোণার শিশু?—আজ তিন বৎসর সে যে মার বুক খালি করিয়া কোথায় লুকাইয়াছে!—সে কেন তাহাকে এত শাস্তি দিয়াছে,—এক বৎসরের জন্য মার কোলে আসিয়া,—সমস্ত জীবনব্যাপী ক্ষোভে মার বুক ভরিয়া দিয়া সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে গো?—মনীষা প্রাণ ভরিয়া তাহার যত্ন করিতে পারে নাই, শুশ্রূষা করিতে পারে নাই,—চিকিৎসা করাইতে পারে নাই,—বাছা যে দৈন্যের পীড়নে বড় অনাদৃত ভাবেই ভুগিয়া ভুগিয়া চলিয়া গিয়াছে, সে বেদনা যে মরিলেও যাইবে না!—মনীষা আর দাঁড়াইতে পারিল না, ঘরে ঢুকিয়া মেঝের লুটাইয়া পড়িয়া মুখে আঁচল চাপা দিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে সহজে কাঁদে না, কাঁদিতেও পারে না—তাহার বড় ভয় পাছে তাহার কান্না দেখিয়া আর কেহ কাঁদিয়া ফেলে। আজ চারি দিক নির্জ্জন – কেউ কোথাও নাই, তাই সে প্রাণ খুলিয়া আজ প্রাণের বোঝা নামাইতেছে।

বাহিরে ঝড়োর হাওয়ার সহিত সবেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, ঝড়ের গর্জ্জন ক্রমশঃ বেশী হওয়ায় বৃষ্টির বেগ ক্রমেই হ্রাস পাইল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ হানিতেছিল, মাঝে মাঝে কড়্ কড়্ শব্দে বজ্রধ্বনি হইতেছিল। দেখিতে দেখিতে বৃষ্টি একেবারে থামিয়া গেল, আর ক্রুদ্ধ দানবের মত বিকটতাণ্ডবে লাফালাফি করিয়া—চারি দিক কাঁপাইয়া, গোঁ—গোঁ—শব্দে ঝড় বহিতে লাগিল।

মনীষার বুকের ভিতর আজ শোকের তুফান উথলিয়া উঠিয়াছে। পুত্রের ক্ষুদ্র জীবনীর সমস্ত স্মৃতিটুকু আজ এক-যোগে তাহার নিভৃত বেদনা-মণ্ডিত হৃদয়টা মুহুর্মুহু আঘাতে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে,—পুত্রের মৃত্যুর দিনের ভয়াবহ স্মৃতিটা যতই দুঃসহ হউক, কিন্তু তাহার চেয়েও তীব্র জ্বালাদায়ক স্মৃতি যে সেই রোগে জীর্ণ ক্ষুদ্র জীবনের প্রত্যেক দিনগুলার প্রত্যেক অভাবের মুখে—দুর্ব্বিসহ দারিদ্র্য-লাঞ্ছনা!—পয়সার অভাবে,—নিজেদের শিক্ষার অভাবে—ছোট শিশুর ছোট সেবায় কত বৃহৎ হইতেও বৃহত্তর, অমার্জ্জনীয় ত্রুটি ঘটিয়াছে! ওঃ নিরুপায় ক্ষোভে বুক যে ফাটিয়া

যায় ? বৃদ্ধা শ্বাশুড়ী, তাহার পুত্রের মৃত্যুর পর যখন আছাড় খাইয়া কাঁদিয়াছিলেন "তুই কেন গেলিরে মাণিক"—তখন মনীষা তাইত শুধু ক্ষুব্ধ বেদনায় আক্ষেপ করিয়াছিল "তুই যে বড় দুঃখ পেয়ে গেলি বাবা !"—তাহার দুঃখ শুধু ঐ টুকু, অবোধ জীব বড় দুঃখ পাইয়া গেল। নিজের কথা ভাবিয়া—কেন গিয়াছে বলিয়া—সে একবারও শোক অনুভব করে নাই—নিজেদের অপরাধের জন্তই সে শুধু সন্তপ্ত হইয়াছিল।

পৈতৃক সম্পত্তি যা কিছু ছিল তাহা ঘুচাইয়া এবং মনীষার গহনা কয়খানি বন্ধক দিয়া অতি কষ্টে খরচ জুটাইয়া স্বামী আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তখন সবে জেলাকোর্টে ঢুকিয়াছেন। কাযেই তখন ঘরের কড়ি ভাঙ্গিয়া কষ্টে সৃষ্টে দিন কাটান হইতেছে, পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর দোষেই হোক, আর পচা পুকুরের জল মিশান গাই দুধ খাইয়াই হোক, আট মাস বয়সেই শিশু—যকৃতের পীড়ায় আক্রান্ত হইল। মামুলী প্রথামত প্রথমতঃ জলপড়া, তেলপড়া, পরে পাঁচু, গোপাল ও পঞ্চাননের চেলাগণের চিকিৎসা চলিল, শিশু দিন দিন জীর্ণ হইতে লাগিল, কোন ঔষধই ধরিল না। অবশেষে গ্রামের কবিরাজ আসিলেন, দিনকতক তাঁহার চিকিৎসার গুণে শিশু ভালই রহিল, তাহার পর আবার যে সেই। পয়সা নাই যে ভাল চিকিৎসক আনান হয়। অনেক চেষ্টা ও চিন্তার পর দেনার উপর দেনা করিয়া সহর হইতে চিকিৎসক আনান হইল, কিন্তু হায়—তখন যে আর চিকিৎসার সময় নাই, পরদিন সন্ধ্যার সময় বালকের মৃত্যু হইল।

সকলে সান্ত্বনা দিল যে চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু হায়! হায়! সে যে ও কথায় কিছুতেই মনকে আশ্বস্ত করিতে পারে না। আগাগোড়া অনিয়মে ও ত্রুটিতে ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত শক্তিটুকু নিঃশেষিত করিয়া শেষের দিকে সেই টানা হেঁচড়ায় আর কি কোন ফল হয় ?—সে যেন আরো মর্ম্মান্তিক যাতনা বলিয়াই মনে হয়।

হইতে পারে শিশুর নিয়তি পূর্ণ হইয়াছিল, তাই সে চলিয়া গিয়াছে। যাউক, তাহাতে দুঃখ কি, কিন্তু তাহার জন্য যে কর্ত্তব্যগুলো তাহাদের করিবার ছিল, সেগুলো কি তাহারা সব করিতে পারিয়াছিল ? না না, তাতো পারে নাই,—তাহার কিছুই যে পারে নাই গো—সেই টুকুই যে দুঃখ ?

আজ তাহার স্বামী উপার্জ্জন করিতেছেন, আজ তাহাদের সমস্ত দৈন্য, সমস্ত অভাব ঘুচিয়াছে, তাইত আজ এ স্বচ্ছলতার মাঝে বসিয়া—আকুলতায় তাহার বক্ষঃস্থল ভরিয়া উঠিতেছে !—সে জোর করিয়া সব ভুলিয়া থাকিতে চায়। পাছে স্বামীর মনে কষ্ট হয় বলিয়া ভয়ে সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসও ফেলিতে পারে না, তবু—ওগো তবুও গোপন অন্তঃকরণ হইতে যে সেই অতীত কাহিনীর

একটা অক্ষরও মুছিয়া যায় নাই?—তা যে সবই তেমনি উজ্জ্বল অটুট আছে?

হায়! মানুষ, মানুষের কাযের বাহির দিকটা দেখিয়া তাহায় 'আঁতে ঘা' বসাইয়া বুক ভাঙ্গিয়া দেয়, সে জানে না ইহার ভিতরটায় কিছু আছে কিনা—কোন্ আবেগের উৎস তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে সেটা সে বুঝিয়া দেখে না, খুঁজিয়া দেখিতে চাহে না। মানুষ বাহিরের হাত পা গুলা লইয়া কি করিতেছে—সেই টুকুর উপরই শুধু তাহার তীব্র দৃষ্টি! ওগো সে কি করিয়া সকলকে বুঝাইবে যে, অন্তরের কি দুর্ব্বহ নিগূঢ় বেদনাকে সে এই প্রকাশ্য স্থূলতার মাঝে সূক্ষ্ম তৃপ্তিতে সার্থক করিয়া লইতে চায়?—সে কোন প্রমাণে দেখাইবে যে, সে যে ঐ দরিদ্র দুঃস্থের সেবার মাঝে নিবিড় ভাবে আপনাকে মিশাইয়া দিতে চায়,—তাহা পশ্চাতের কোন অসহ্য তাড়নায়?—সম্মুখের কোন শান্তিময় আশায়?—

না গো না, পৃথিবীর বুদ্ধিমান্ মানুষ নির্ব্বোধের দুর্ব্বলতার ক্ষমা করিতে পারে না।—ভগবান্ নিজে যখন তাহার বুক খালি করিয়া পুত্রকে কাড়িয়া লইয়াছেন, তখন সে যে পরের পুত্রকে বুকে করিয়া ফাঁকী দিয়া শান্তি ভোগ করিবে, সে ত্রুটি কেহই সহ্য করিবে না!—সে যে নিজের তৃষিত মাতৃত্ব, অতৃপ্ত, বেদনাহত স্নেহরাশি পরের শিরে ঢালিয়া হৃদয়টা হাল্কা করিয়া সুখী হইবে,—সে অমার্জ্জনীয় অপরাধ কেহই ক্ষমা করিবার ক্লেশ স্বীকার পাইবে না। না করুক,—কাহারও উপর তাহার জোর নাই। কাহার উপরই বা সে অভিমান করিবে? যখন নিজের গর্ভজাত সন্তান হইতেও সে বঞ্চিতা, তখন পরের সন্তানের উপর এ তৃষাকুল মমতা মানুষ কেন সহ্য করিবে?

—অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত আবেগে মনীষা মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া চিৎকার করিয়া ডাকিল "ওরে আয় বাবা আয়, একবার আয়, আজ তুই নেই বলে সবাই আমার পর,—তুই ছেড়ে গেছিস বলে কেউ আর বিশ্বাস করে আমার হতে চায় না—ওরে তুই একবার আয় বাবা!"

সহসা উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন ডুবাইয়া, বাহিরের ঝড়ের গর্জ্জন ভেদ করিয়া,—ঠিক যেন সেই আকুল আহ্বানের প্রত্যুত্তরের মতই কোথা হইতে কে আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল "মা—মা—মা!"

চকিতে উন্মাদিনীর মত দ্বার ঠেলিয়া মনীষা বারান্দায় আসিল, সত্যইত—ও যে সত্যকার আহ্বানই বটে!—ঐ যে আবার শুনা যাইতেছে মা—মা—।

প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া কতকগুলি নরনারী উদ্দাম ঝঞ্ঝাশব্দ ভেদ করিয়া, কাতরকণ্ঠে তাহাকে ডাকিতেছে,—মা—মা রক্ষে করুন, গরীবদের জীবন বাঁচান!"

ঝড় বৃষ্টিতে ইহাদের ক্ষুদ্র কুটীর দুইখানি পড়িয়া গিয়াছে, ইহাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই। দৃষ্টিহীন অসমর্থ জননী ও পরিবারস্থ কয়জন পুরুষ এবং একটী

মুমূর্ষু শিশু লইয়া স্বামী স্ত্রী আজ নিরাশ্রয়, এ বর্ষণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মাথা গুঁজিয়া দু দণ্ডের মত দাঁড়াইবার স্থান নাই,—আশ্রয় দাও জননি,—অনাথদের আশ্রয় দাও!

মনীষা বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিল! সে এখনই না সন্তানকে ডাকিতেছিল? এখনই না সে তাহার বুভুক্ষিত সেবা-বৃত্তির চরিতার্থতার জন্য অবলম্বন খুঁজিতেছিল, একি তাহাই? একি তাহাই? হাঁ তাহাই বটে!—নিশ্চয় তাহাই, তাহার মর্ম্মভেদী আকুলতার উত্তরে উহারাই যে সান্ত্বনার বাণী শুনাইয়াছে, উহারাই যে ডাকিয়াছে, মা!—

মনীষা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া নামিয়া গেল, তাহার চক্ষের জল তখন শুকাইয়াছে।

(৪)

তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে, জল ঝড় সমস্ত থামিয়া আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, নীল আকাশের কোলে বসিয়া শান্ত স্মিত শশধর উজ্জ্বল জ্যোৎস্নারাশি ঢালিতেছেন। সে দিন শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী।

স্থানীয় উৎসাহী বিদ্বান্ ভদ্রলোক ও নিষ্কর্ম্মা যুবকবৃন্দের দ্বারা স্থাপিত "দারিদ্র্য কষ্ট নিবারণী" সভার আজ অধিবেশন ছিল। কোর্টের কয়জন উকিলই সে সভার যথাবিধানে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ। সুতরাং মুক্লেক বাবুকেও সেখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হইয়াছিল। জল ঝড়ের প্রকোপে সভা যথাসময়ে বসিতে পারে নাই,—সভ্যগণ সবাই জুটিলে তবে অনেক বিলম্বে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়, এবং একটু রাত্রি করিয়া সভাভঙ্গ হইয়াছে,—কারণ সভার সঙ্গে সত্যকার কার্য্যের সম্পর্ক যতটুকু থাক না থাক,—প্রয়োজনাতিরিক্ত তর্ক বিতর্ক, এবং সভ্যগণের বক্তৃতার কারণ যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছিল।

সেই তর্ক বিতর্কের ঘাত প্রতিঘাতে সভ্যগণের সকলের চিত্তই অল্পাধিক পরিমাণে বিচলিত হইয়াছিল। মহেন্দ্রনাথও পথে আসিতে আসিতে সেই কথাই ভাবিতেছিলেন, এমন সব মনস্বী বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্‌গণের উচ্চ উদ্দেশ্যগুলির পরিণাম, কেন এমন বিরক্তিজনক শোচনীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়, তাঁহাদের উন্নত সঙ্কল্প সাধনের পথে এত বিঘ্নই বা কেন এবং তাহার সিদ্ধি ফলগুলিই বা এত বিকৃত কেন?

এই যে এতক্ষণ ধরিয়া এতগুলি ভদ্রসন্তান এত বাগ্‌বিতণ্ডার পর করিলেন কি না আবেদন নিবেদনের করুণ কাতরোক্তিপূর্ণ অনুনয়-লিপি গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশে প্রেরণ মাত্র, আর কিছু নয়!—হাতে কলমে চূড়ান্ত কার্য্যদক্ষতা দেখাইয়া এবার সবাই নিশ্চিন্ত, আর তাঁহাদের কর্ত্তব্য কিছু নাই! এমন করিলে কি কাহারো কিছু সত্যকার শ্রেয়ঃ আছে? ইহাঁরা পৃথিবীর সমস্ত দারিদ্র্য দূর করিতে চান, কিন্তু গুরুচারের

খাত্তিরে স্বয়ং কিছু স্পর্শ করিতে নারাজ, দূর হইতে ফুঁ দিয়া ইহাঁরা পর্য্যন্ত উড়াইতে চান!

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া তিনি লণ্ঠনবাহক আর্দ্দালীকে বিদায় দিয়া স্বয়ং অগ্রসর হইলেন। সিঁড়িতে তাঁহার জুতার শব্দ পাইয়া বৈঠকখানার পাশের ঘর হইতে ভৃত্যেরা তাড়াতাড়ি আলোক লইয়া বাহির হইল এবং তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই কয়েক জন নীচ শ্রেণীর হিন্দুস্থানী পুরুষ বাহির হইয়া আভূমি-প্রণত-শিরে সমস্বরে ধর্ম্মাবতারের জয় ঘোষণা করিল। মহেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন। দু একটা প্রশ্নের পর সংক্ষেপে উহাদের বিপদের কথা এবং ইহাদের আশ্রয়দাত্রী 'মা ঠাকুরাণীরা' করুণাময় বদান্যতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আদ্যোপান্ত শুনিয়া তিনি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারাও না সকলে মিলিয়া এইরূপ আকারের একটা মহৎ কাজের কল্পনায় এতক্ষণ মাথা ঘামাইয়া—সময় কাটাইয়া আসিলেন?—চকিতে তাঁহার মনে একটা প্রশ্নের উদয় হইল, এতক্ষণের মধ্যে যথার্থ কায করিল কে? বাহিরে গিয়া তিনি—না ঘরে বসিয়া তাঁহার সেই নগণ্যা পত্নী?

অকস্মাৎ তীব্র কশাঘাতের মত তাঁহার সে দিনকার সেই হৃদয়হীন রূঢ়তার কথা স্মরণ হইল!—ছিঃ, এই কাযের জন্যই—এই স্ত্রীর সঙ্গে তিনি কি রূঢ় ব্যবহার করিয়াছেন। "আজ যদি মনীষার মমতা-শ্রয়ে ইহারা স্থান না পাইত—তাহা হইলে এই দুঃস্থ বিপন্নগুলির কি দুর্দ্দশাই হইত?—

মুহূর্ত্তে নিজের সহিত স্ত্রীর আচরণ-গুলা মিলাইয়া নিজেকে একটা ভণ্ড বলিয়া তাঁহার স্পষ্ট ধারণা হইল। তাঁহারা পরার্থপরতার মুখস পরিয়া—বাহবা লইবার জন্যই গরীবের জন্য ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু গরীবের সুখ দুঃখের সঙ্গে তাঁহাদের সত্যকার প্রাণের যোগ কতটুকু আছে? কিছুই না, তাঁহারা গরীবের প্রাণ বাঁচাইবার অছিলায় নিজেদের নাম কিনিতে চান মাত্র।—ধিক্! আর এই নারী,—কাহারো সাহায্যের অপেক্ষা না রাখিয়া, নিজের ভিতরকার সমস্ত শক্তিটুকু, নিজের প্রভাবে জাগাইয়া তুলিয়া—এতগুলি প্রাণীর সুখ সুবিধার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া, নিঃশব্দে এত কল্যাণ সাধন করিতেছে—তিনি বর্ব্বর, তাই এই কাজ হইতে এমন লোককে থামাইয়া রাখিয়া মান বাঁচাইতে চাহেন?

মহেন্দ্রনাথের মন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি তাহাদের সমস্ত মন্তব্য ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতে পারিলেন না, বাধা দিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমা-দের খাওয়া হয়েছে তো?"

তাহারা সসম্ভ্রমে মাথা নোয়াইয়া উত্তর দিল "আজ্ঞে অন্নপূর্ণার রাজ্যে কেউ উপবাসী থাকে কি ধর্ম্মাবতার? আমা-দের শোবার জায়গা অবধি হয়ে গেছে,

শুধু আপনার জন্যে আমরা..............
.........।"

তাহাদের শয়নের আদেশ করিয়া মহেন্দ্রনাথ দ্রুতপদে উপরে চলিলেন, ভৃত্য আলো লইয়া অনুগামী হইতেছিল, তিনি হস্তে ইঙ্গিতে বারণ করিলেন,—"আজ চাঁদের আলো আছে! সিঁড়ি দেখা যাইবে।"

উপরে আসিয়া দ্বার ঠেলিয়া তিনি কক্ষে ঢুকিলেন, দেখিলেন আনন্দ-ফুল্ল-মুখে উৎসাহিত-কণ্ঠে অনর্গল বকিতে বকিতে দীনুয়া পরম আরামে মেঝেয় গড়াগড়ি দিতেছে, আর সদ্য-ধৌত বস্ত্র পরিয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশে এক হিন্দুস্থানী রমণী বাতাস দিয়া কড়াইয়ের আগুনের ছাই উড়াইতেছে, আর তাহার ওধারে বসিয়া—স্নেহাপ্লুত বদনে ক্রোড়স্থ শিশুকে দুগ্ধপান করাইতেছে, ওকে—মনীষা স্বয়ং!

মহেন্দ্রনাথের বুকে ধক্ করিয়া একটা ঘা লাগিল, মনীষার এ মনোহারিণী মূর্ত্তি তিনি যে আজ তিন বৎসর দেখেন নাই, আজ তিন বৎসর সে যে পুত্রহারা, উচ্ছৃঙ্খলা, আত্মবিস্মৃতা, যেন কেমন এক রকমের মানুষ হইয়া আছে,—আজ এত দিনের পর কোন শক্তিশালী প্রাণ,—তাহার সে লুপ্তগৌরব লাবণ্য উদ্ধার করিয়া আনিয়া—তাহাকে আবার ঐ সংহত সুন্দর নারীত্বে—ঐ স্মিতোজ্জ্বল মাতৃত্বে মণ্ডিত করিয়া তুলিল? কে সে পরাক্রমশালী মহাশূর?

মহেন্দ্রনাথের হৃদয়ের মধ্যে কি এক অদ্ভুত বিচিত্র-রঞ্জিত শক্তি-স্পর্শে অকস্মাৎ রুদ্ধ নির্ঝর খুলিয়া অপার্থিব শান্তির উৎস ছুটিল, তাঁহার মর্ম্মের মধ্যে শুধু একটী উচ্ছ্বাস ধ্বনিত হইল —ধন্য ভগবান্!

মহেন্দ্রনাথকে দেখিবামাত্র দীনুয়ার মুখরিত চাঞ্চল্য চকিতে অন্তর্হিত হইল, সেই শিশুর জননী হিন্দুস্থানী রমণী ত্রস্তে পাখা ফেলিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল, আর মনীষা মাথায় কাপড় তুলিয়া রুগ্ন শিশুকে বুকে করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিতে উদ্যত হইল।

মহেন্দ্রনাথ প্রীতি-উদ্বেলিত কণ্ঠে বলিলেন "থাক থাক মনীষা ঐখানেই থাক, উঠো না—তোমার ও মূর্ত্তি যে এত সুন্দর, অদম্যগ্রাহী তা আমি জানতাম না। না বুঝে অন্যায় ভাবে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি ক্ষমা করো।"

মনীষা শুধু একবার কৃতজ্ঞ কোমল দৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে চাহিল, তার পর শান্ত স্বরে বলিল "এস"।

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

স্নেহের ইন্দুপ্রকাশের উদ্দেশে তাঁহার পত্নীর প্রতি। *

১

"বিগত সাতই "মে"তে, অ্যাট্‌লাণ্টিক সাগরেতে,
ডুবিয়াছে আমাদের সেই ইন্দুপ্রকাশ,"
শুনে নিদারুণ কথা, মরমে পশিল ব্যথা,
ভারতের কি দুর্ভাগ্য কে করে প্রকাশ!

২

ছিল ইন্দু কৃতিমান্, সাহিত্যিক সুবিদ্বান্,
নির্ভীক কর্ত্তব্যকর্ম্মা বীরের সমান,
উঠিয়া সে জ্ঞান-রথে চলেছিল ধর্ম্মপথে,
সরল বিশ্বাসে বুঝে সত্যের বিধান।

---

* ইন্দুপ্রকাশ "বিদ্যাসাগর জীবনী" লেখক প্রবীণ সাহিত্যসেবী স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। কলিকাতায় B. A. পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া, তিনি কিছুকাল বঙ্গের জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কার্য্য করেন, এবং কয়েকখানি বাঙ্গালা পুস্তক লিখিয়া অল্প দিনের মধ্যে উদীয়মান লেখকদিগের মধ্যে গণ্য হন। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষকরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার গুণের সমাদর করেন। কিন্তু ইন্দুপ্রকাশ এখানেই ক্ষান্ত হইলেন না, আরও বিদ্যার্জ্জন করিবার লালসায় নিজের চেষ্টায় অক্লান্ত পরিশ্রমে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আমেরিকাতে যাত্রা করিয়াছিলেন। সেখানে বি, এ, ও এম, এ, পাশ করিয়া অল্প দিনের মধ্যে কৃতিত্ব লাভ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, পথিমধ্যে এই দুর্ঘটনা হয়। লুসোটিনিয়ার যাত্রী হইয়া তিনি আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে আসিতেছিলেন। বিগত ৭ই মে তারিখে, জার্ম্মণ টর্পিডোর আঘাতে জাহাজখানি সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়। ইন্দুপ্রকাশ তেজস্বী, স্বভাবতঃ মেধাবী ও একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী ছিলেন।

আমরা অতি শৈশবকাল হইতে তাঁহাকে চিনিতাম, এবং তাঁহার এই উন্নতিতে আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম যে, ভারতের একটি সন্তান আমাদের ভ্রাতা এইরূপ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিলেন। তিনি এই বামাবোধিনীর লেখক হইয়া সময় সময় কত প্রবন্ধ দিয়া ইহার সাহায্য করিতেন। আমরা কত আশা করিয়াছিলাম যে, এবার ফিরিয়া আসিয়া তিনি আমাদের কত ভাল ভাল কথা শুনাইবেন। তিনি স্ত্রী-শিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার লেখার মধ্যে আমরা যে সরসতা, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতার আভাস পাইতাম তাহা আর পাইব না জানিয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ হইতেছি। ইন্দুপ্রকাশ তাঁহার বিধবা পত্নী ও তিনটী শিশুসন্তান রাখিয়া গিয়াছেন, এবং বৃদ্ধ পিতা মাতা ভাই ভগিনী আত্মীয় স্বজন অনেক আছেন, তাঁহাদিগকে আমরা কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব জানি না। জগদীশ্বর তাঁহাদের প্রাণে সান্ত্বনা দিন এবং সেই অমর আত্মা দিব্য ধামে বাস করিয়া আরও জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যে ভূষিত হইয়া দিন দিন উন্নত হউন, দয়াময়ের চরণে এই প্রার্থনা করি।

৩

বিদ্যা-উপার্জ্জন তরে, গিয়াছিল সিন্ধুপারে,
হয়ে সেথা সিদ্ধকাম আসিবে সে ঘরে,
বিখ্যাত অর্ণবযানে, 'লুসিটেনিয়া' নামে,
জার্ম্মাণের অস্ত্রাঘাতে ডুবেছে সাগরে।

৪

কত শত নরনারী, যেরে হ'ল পাপাচারী,
জগদীশ করিবেন ন্যায়ের বিচার,
মোদের স্নেহের ইন্দু, হেরি সে বিশাল সিন্ধু,
কেমনে তাজিল দেহ সম্মুখে কাহার ?

৫

সাক্ষী তার দিবাকর, বিধাতা মঙ্গলাকর,
আর কেবা শুনিয়াছে আকুল ক্রন্দন,
'আমায় বাঁচাও বলে,' বুঝিবা নয়নজলে,
বলেছিল কত কথা কাপ্তেনে তখন ?

৬

অকূল পাথারে পড়ে, হতবুদ্ধি নারী নরে,
কার কথা কে শুনিবে বিপদ যখন ?
অসহায় নিরুপায়, কার দিকে কেবা চায়,
বলে,-"পিতা দয়াময় অনন্তশরণ !

৭

তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক, ছাড়ি আমি ইহলোক,
তোমার অভয় কোলে লই গো বিশ্রাম,
তব শ্রীচরণ ছায়, আছে মোর সমুদায়,
বিশ্বাস নয়নে দেখি পূর্ণ প্রেমধাম।"

৮

অটল বিশ্বাসভরে, দিল প্রাণ অকাতরে,
গভীর অতলস্পর্শ লবণাক্ত নীরে,
সমাধি হয়েছে তার, এ বিধান বিধাতার,
তাই এই শোকবার্ত্তা ঘোষিল অচিরে।

৯

ইন্দুপ্রকাশের নাম, করে সবে অবিরাম,
কত গৃহে উঠে আজ হাহাকার ধ্বনি,
বিদেশে অর্ণবযানে, ত্যজিলে গো কেন প্রাণে,
এই ভেবে দিবানিশি কাঁদেন জননী।

১০

প্রাণে ছিল কত আশা, প্রিয়জনে ভালবাসা,
কি যে মিষ্ট মাতৃভাষা বলিব কি তার,
বিদেশে বাঙ্গালী নাম, রেখেছিল মূর্ত্তিমান্,
এক ছিল ধ্যান জ্ঞান ভাষার প্রচার।

১১

পিতা মাতা ভাই বোন্, প্রাণের অপত্যগণ
বুঝে নাই তায় দেহে দেখিবে না আর,
প্রিয়তমা ভার্য্যা তারে, আরো সুখী করিবারে,
চেয়ে ছিল তার প্রাণ সতাই এবার।

১২

"হায়! নারী পতিহীনা, দিবানিশি বিমলিনা,
তোর দশা দেখে প্রাণ কাঁদে সবাকার,
কি বলে সান্ত্বনা দিব, সকলের মুখে শিব,
এই ভেবে শোক তাপ ছাড় একবার।

১৩

সেবা কর কায়মনে, পতিবন্ধু গুরুজনে,
আর সেব শিশু তিনে বিধাতার দান,
তাহারা মানুষ হ'লে, ইন্দুর সন্তান বলে,
তোমার স্বামীর পুন হবে যশোগান।

১৪

আমরা হিন্দুর জাতি, সদা আনন্দেতে মাতি,
মানব-আত্মার মৃত্যু কভু শুনি নাই,
আত্মা সে অমৃত ধামে, সদা প্রেমসুধা পানে,
আনন্দেতে মাতোয়ারা শুধু ভাব তাই।

১৫

এ শুধু কল্পনা নয়, লও তার পরিচয়,
ডাক পিতা দয়াময় প্রেমের আধার,
চির ব্রহ্মচর্য্য লয়ে, নিষ্ঠাবতী সতী হয়ে,
নিশি দিন কর ধর্ম্ম সাধনা তাঁহার।

১৬

খুলে যাবে ব্রহ্মলোক, ইহলোক পরলোক,
একই পিতার কোলে আমরা সবাই,
পেয়ে পতি গুণবান্, পরিপূর্ণ হবে প্রাণ,
আর নাহি রবে ম্লান আনন্দ সদাই।"

কাকা বাবু।

বারাণসী-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চেতগঞ্জ।

চেতগঞ্জ সহরের অন্তে অবস্থিত। যেখানে পুলিশ কোতোয়ালী অবস্থিত, সেখানে রাজা চেতসিংহের একটা বাজার আছে। চেতগঞ্জে হিন্দুদিগের পিশাচ-মোচন নামে কেবল একমাত্র তীর্থস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণী। তীর্থযাত্রী মাত্রেরই এই স্থানটী দ্রষ্টব্য। লোকের বিশ্বাস এই যে, এই স্থানে স্নান করিলে ভূত পিশাচাদির ভয় অথবা দুঃস্বপ্ন হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। প্রবাদ এইরূপ যে, একদা একটি পিশাচ বারাণসী ধামের পূত স্থানে ভয়ে ভয়ে আগমন করিতে-ছিল। পঞ্চকোশীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ তাহার গতিরোধ করেন। কিন্তু পিশাচ অধিক বলশালী ছিল বলিয়া তাহার নিকট দেবতাগণ পরাজিত হন। ক্রমে পিশাচ "পিশাচ মোচন" পুষ্করিণী পর্য্যন্ত আগমন করে। এইখানে ভৈরবনাথের সহিত তাহার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ভৈরবনাথ পিশাচের শিরশ্ছেদ করিয়া বিশ্বেশ্বরের নিকট লইয়া যাইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা নিবেদন করেন। পিশাচের শির-শ্ছেদ হইলেও সে বাকশক্তিহীন হয় নাই। তাহার কাটামুণ্ড মহাদেবের স্তব করিতে লাগিল। মহাদেব স্তবে তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিতে উদ্যত হইলে পিশাচ এই বর প্রার্থনা করে যে তাহাকে যেন পূত স্থান হইতে দূরীভূত না করা হয় এবং গয়াযাত্রীরা যেন পূর্ব্বে পিশাচ-

মোচন স্থান দর্শন করিয়া গয়ায় গমন করে। মহাদেব 'তথাস্তু' বলিলেন। তদবধি লোকে গয়ায় গিয়া পিণ্ড দিবার পূর্ব্বে "পিশাচ-মোচন" দর্শন করিয়া যায়। কিন্তু যদি কেহ অজ্ঞাত থাকায় উক্ত স্থানে গমন না করিয়া গয়ায় গমন করে, তবে পাণ্ডারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি বারাণসী ধামের পিশাচমোচনে পূর্ব্বে গিয়াছিলে কি না। এইরূপ অবস্থায় গয়াযাত্রীর যাহাতে অসুবিধা না হয় সেই জন্য বারাণসীধামস্থ পিশাচ-মোচনের প্রতিনিধি স্বরূপ গয়াধামে একটি পিশাচমোচন স্থাপিত হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ব্যবসা ও উপজীবিকা।

বারাণসী ধামে বর্ত্তমান ব্যবসা তেমন কিছুই নাই। তবে সূতি ও চিকের কাপড় প্রচুর পরিমাণে তৈয়ার হইয়া থাকে। ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যাদি যে প্রস্তুত হয় না তাহা নহে। সাদাই হউক বা ফুলদারই হউক, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তানজেব এখানে পাওয়া যায়। মোটা কাপড়েরই প্রাচুর্য্য অধিক, পাতলা কাপড় তেমন দেখা যায় না। তবে তানজেবের কথা স্বতন্ত্র। এখানে কাপড় রঙ্গান অথবা কাপড় ছাপাই অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। বারাণসী ধামের খেলনারও আদর অধিক। আমরা যে তানজেবের কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা বস্তুত মলমল। কাপড় ছাপিবার জন্য ছাঁচ আছে, তদ্দ্বারা ছাপাই কার্য্য হইয়া থাকে। ছাঁচগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত। আম, শিশু বা আবলুস কাষ্ঠ ছাঁচ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। সূত্রধর ছাঁচ তৈয়ার করিয়া থাকে। তাহাকে নিম্নলিখিত হিসাবে পারিশ্রমিক দিতে হয়ঃ—

(১) "বেল হাঁসিয়া" (ফুলদার কিনারা) ৪ আনায় প্রত্যেক ছাঁচ।

২। "বেল বুটি" (ইহাতে একটা করিয়া ফুল থাকে) ঐ।

(৩) "বেল হাজি" (ফুলদার কিন্তু কোণাকোণী) ৮ হইতে ১২ আনায় ছাপা যায়।

(৪) "তহরীর" (অক্ষর, পদ্ম, আকৃতি প্রভৃতি এই ছাঁচে থাকে) ২ টাকা হইতে ৪ টাকা একসেট।

একজন নিপুণ সূত্রধর কাঠের মূল্য ব্যতীত দৈনিক আট আনা উপার্জ্জন করিতে পারে। ছাপাওয়ালা গঁদ, খড়ি এবং শিরিষের একটা সংমিশ্রণ প্রস্তুত করে। যে কোন প্রকারের ছাপিতে হইবে তাহার ছাঁচ লইয়া উক্ত সংমিশ্রণে ডুবাইয়া কাপড়ে ছাপ লাগাইতে থাকে। অতঃপর রূপলী পাত লইয়া তাহার উপর রাখিয়া একটা গদি দ্বারা চাপিয়া দেয়। তাহাতে রূপলী পাতগুলি ছাপা স্থলে সংলগ্ন হইয়া যায়। রূপলী ছাপারও পার্থক্য আছে। কেহ কেহ রাঙ্গা, গঁদ, শিরিষ এবং খড়ি দিয়া একটা সংমিশ্রণ প্রস্তুত করে। ইহাতে ছাঁচটা নিমজ্জিত করিয়া ছাপিতে থাকে। দাগগুলি শুষ্ক হইলে কাপড়টার উপর একটি কাষ্ঠ দ্বারা ঘর্ষণ করিতে হয়। তাহাতে শ্বেত-

ঘর্ষের উজ্জ্বলতা ফুটিয়া উঠে। ঘর্ষণ-কাষ্ঠটী মুহুরা নামে খ্যাত। শেষোক্ত প্রণালীর ছাপাওয়ালা মাসে ৫ টাকার অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে না।

ছাপিবার পূর্ব্বে প্রথমে কাপড়টাকে তিল বা রেড়ির তৈলে ডুবাইয়া সাজি মাটির জলে নিমজ্জিত করিতে হয়। এই প্রণালী অবলম্বন করিতে হইলে প্রথমে একজন ব্যক্তি তৈল ও অন্য এক জন সাজিমাটির জল লইয়া একটা নাদের উপর এপ্রকার উচ্চ হইতে ছাড়িতে থাকে যে, তাহা নাদে পতিত হইয়া যেন ফেনময় হইয়া যায়। অতঃপর কাপড়খানাকে তাহাতে ডুবাইয়া নিংড়াইয়া লইতে হইবে। অনন্তর তাহাকে একটা সুবৃহৎ কাপড়ে বাঁধিয়া পরদিন শুষ্ক করিতে হইবে। এইরূপ প্রক্রিয়া বার বার করিয়া যখন তৈলের গন্ধ থাকিবে না, এবং দাগও দেখিতে পাওয়া যাইবে না, তখন রজককে দিয়া কাপড়খানি নদী হইতে কাচাইয়া লওয়া হয়। অতঃপর কাপড়ের কিনারা ছাপা হইয়া থাকে। এ ছাপাটী বেমালুম থাকে, সাধারণ লোকে দাগটী দেখিতে পায় না, কেবলমাত্র নিপুণ ব্যক্তিই দেখিতে পায়। অতঃপর একটা কটাহে জল চড়াইয়া অগ্নির উপর রাখিতে হয়। জলে ফুট ধরিলেই তাহাতে পলাশবৃক্ষের কুট্‌মল ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তৎপরে তাহাতে মঞ্জিষ্ঠা ছাড়িয়া দিয়া কাপড়টা তাহাতে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া লইতে হইবে। কিয়ৎকাল পরে আরও মঞ্জিষ্ঠা ছাড়িয়া দিয়া কাপড়টাকে উঠাইয়া লইয়া শুষ্ক করিতে হইবে। ইহাতে পূর্ব্বকৃত ছাপার দাগগুলি যাহা একপ্রকার চক্ষের অগোচর ছিল তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইবে। ইহার পর রজক নদীতে ধুইয়া কাপড়খানি শুকাইতে দেয় ও মধ্যে মধ্যে জলের ছিটা দিয়া তাহাকে আর্দ্র করে। মোট কথা কাপড়খানি একেবারে শুষ্ক না করিয়া ক্রমশঃ করিবে। এই সকল প্রক্রিয়ার পর কাপড়খানি ছাপিবার উপযুক্ত হইবে। ছাপা কঠিন ব্যাপার। ফুলই হউক বা চেকই হউক একবার ছাপাতে সমাধা হয় না। বিভিন্ন রংগুলি বিভিন্ন ছাপায় ছাপিতে হইবে। ছাপিবার সময় ছাপাওয়ালা ছাঁচটী বাম হস্তে ধারণ করে এবং দক্ষিণ হস্ত দিয়া তদুপরি আঘাত করিয়া থাকে। পাছে হস্তে আঘাত লাগে তজ্জন্য দক্ষিণ হস্তে একটা চর্ম্ম জড়াইয়া লয়।

কাল রং তৈয়ার করিতে হইলে নিম্নলিখিত বস্তু ও প্রক্রিয়ার আবশ্যক।

পুরাতন লৌহ...২০ সের।
গুড় ... ৫ সের।
তিল ...১০ ছটাক।

গুড়কে জলে গুলিয়া তাহাতে তিল ছাড়িয়া দিতে হইবে। অতঃপর তাহাতে উল্লিখিত ওজনের পুরাতন লৌহ ছাড়িয়া দিয়া আট দিন পর্য্যন্ত ভিজিতে দেওয়া হয়। আট দিনে রং প্রস্তুত হইয়া যাইবে। তখন তাহা লইয়া গঁদের সহিত মিশ্রিত

করিতে হইবে। এই রংটী তৈয়ার করিতে এক টাকা ৬ আনা ৩ পয়সা খরচ পড়ে, কিন্তু রংটি বৎসরাবধি কার্য্য দিবে।

ধূসরবর্ণ তৈয়ার করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপাদানগুলির আবশ্যক :—

কাল রং (পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা তৈয়ার হইলে) ৪ ছটাক।
ফট্‌কিরি… ৮ ঐ
সেরু…… ৪ ঐ
টাক (পলাশ) বৃক্ষের গঁদ…১২ ঐ

এইগুলি জলে মিশ্রিত করিলেই ধূসরবর্ণ প্রস্তুত হইল। ইহাতে ৫ আনা ১ পয়সা খরচ পড়ে এবং প্রায় ৯ খানা কাপড় ছোপান যাইতে পারে।

লাল রঙ্গের মশলা যথা :—

সেরু … ৪ ছটাক।
ফটকিরি… ৮ ঐ
লোধ … ৪ ঐ
হলুদ … ½ ঐ
টাঁকের গঁদ …১২ ঐ

লোধকে উত্তমরূপে পিসিয়া জলে ফুটাইতে হয়। ফুটিতে থাকিলে হরিদ্রা সংযোগ করিতে হইবে। অতঃপর ছাঁকিয়া সেরু, ফট্‌কিরি এবং গঁদ মিশ্রিত করিতে হইবে। ইহাতে ৬ আনা খরচ পড়িবে।

গাঢ় পীতবর্ণ প্রস্তুতের উপকরণ যথা :—

পলাশ পুষ্প…১ সের।
হরসিংগার …২ ছটাক।
ফট্‌কিরি …১ ঐ

পলাশপুষ্প জলে ফুটাইয়া গলাইয়া ফেলিতে হইবে। পরে হরসিংগার এবং ফটকিরি মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া ফেলার পর গঁদ মিশাইতে হইবে।

বারাণসী ধামে চিকের ব্যবসাই প্রধান বলিয়া গণ্য। প্রায় বার সহস্র লোক এই ব্যবসায় নিযুক্ত, তন্মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। চিক, বঙ্গদেশ, মধ্য এসিয়া এবং চিনদেশ হইতে আসিয়া থাকে। শেষোক্ত দেশটীর চিক অতি উত্তম, দেখিতে পীতবর্ণ। মধ্য এসিয়ার চিক "মঙ্গল" নামে খ্যাত। ইহার বর্ণ হয় শ্বেত নতুবা পীত। ইহা সমরকন্দ হইতে আমদানি হইয়া থাকে। বঙ্গদেশ হইতে যে চিক আমদানি হয় তাহা কলিকাতা, মালদা এবং রামপুরহাট হইতে আইসে। চিকের রং করাটা বারাণসীতেই হইয়া থাকে। রেশমী বস্ত্রের মধ্যে কমরধাব, কলাবতু, থান, সংগী, গুলবদন, মশরু, বুলবুলচশ্ম, এবং গেরিয়া তৈয়ার হইয়া থাকে।

এখানে পিত্তলের ব্যবসাও রীতিমত হইয়া থাকে। কাঁসারিগণ এই কার্য্যের মালিক। বারাণসী ধামে অনূন ৩০০ কারখানা আছে। বৃহৎ কারখানায় ২০ জনেরও অধিক ব্যক্তিকে নিযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। নিপুণ কারিকর পারিশ্রমিক অধিক পাইয়া থাকে।

উপজীবিকার মধ্যে জহরীর উপজীবিকাই শ্রেষ্ঠ। ইহারা হীরা প্রভৃতি মূল্যবান্ প্রস্তর বেচিয়া থাকে। মূল্যবান্ প্রস্তর নয় প্রকারের যথা—(১) হীরা (২) পান্না

(৩) যাকুত (৪) নীলম (৫) পুখরাজ (৬) লসনীয়া (৭) গোমেধ (৮) মূগা এবং (৯) মোতী। এতদ্ব্যতীত আরও দুই প্রকারের জহরত আছে তাহার একটির নাম লালরী এবং অপরটীর নাম ফীরোজা। জহরীরা মূল্যবান্ প্রস্তর ক্রয় করিয়া কর্ত্তনকারীদিগকে কাটিবার জন্য দিয়া থাকে। এই কর্ত্তনকারিগণ আল-মাতরাস নামে খ্যাত। ইহারা হীরাকে তিন প্রকারে কাটিয়া থাকে, যথা—(১) পরব (২) পোলকি এবং (৩) কনওয়াল। ইহাদিগের পারিশ্রমিক প্রথমোক্তটীতে ৩ টাকায় রতি, দ্বিতীয়োক্তটীতে ৪ টাকায় রতি এবং শেষোক্তটিতে ৫ বা ৬ টাকায় রতি। হীরা কাটিতে হইলে "সান" নামক যন্ত্রের সাহায্যে কাটিতে হয়। অন্যান্য মূল্যবান্ প্রস্তর কর্ত্তন করিতে হইলে আরও তিন প্রকার "সানের" আবশ্যক হইয়া থাকে যথা—(১) রগড়াই সান, (২) মিহিন সান এবং (৩) জীলা সান। প্রথমটী দেখিতে অতি কদর্য্য, দ্বিতীয়টী অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং তৃতীয়টী কাঁসার। শেষোক্তটিতে পুখরাজ, যাকুত, পান্না, নীলম্ কাটা হয়। লালরী এবং অন্যান্য নরম প্রস্তর কাটিতে হইলে সানটা রঙ্গের হওয়া আবশ্যক। যদি ইয়ারিং এর জন্য হীরা কাটিতে হয় তবে তাহা দুই প্রকারে কাটা হইয়া থাকে যথা—(১) গোসওয়ালা এবং (২) বাদামচা। প্রথমোক্তটী পারাবতের অণ্ডের ন্যায় এবং দ্বিতীয়টী বাদামের ন্যায়। হিন্দুদিগের যেরূপ জাতি আছে হীরারও তদনুরূপ জাতি আছে। বর্ণহীন কাচের মত হীরা ব্রাহ্মণবর্ণের, লাল বা গোলাপী ক্ষত্রীয় বর্ণের, পীতবর্ণ হীরা বৈশ্য বর্ণের এবং ময়লা বা আবিল হীরা শূদ্র-বর্ণের।

কোরা হীরার মূল্যও এক প্রকার নহে। ইহাদিগের আকৃতি বিশেষে মূল্যও বিভিন্ন। (১) অষ্টাস, (২) লাড্ডু এবং (৩) বিলকি নামক তিন প্রকার আকৃতিবিশিষ্ট কোরা হীরা দেখা যায়। শেষোক্তটি বাদামের আকৃতির ন্যায়। কর্ত্তিত হীরাও চারি প্রকারের। সর্ব্বোত্তম শ্রেণীর নাম "কুতবী"। ইহা সমকোণ ভাবে কর্ত্তিত, (২) "আঠোঁয়া," ইহা অষ্টকোণবিশিষ্ট, (৩) "গীর্দ্দা," ইহার উপরিভাগ গোল এবং (৪) "সরো"। শেষোক্তটীও তিন প্রকারের যথা—সরো, পান এবং ত্রিকোণী।

হীরা ব্যতীত অন্যান্য মূল্যবান্ প্রস্তর তিন প্রকারে কর্ত্তিত হইয়া থাকে—যথা (১) তউরা, (২) মথোলা এবং (৩) তিনকরীদার। কর্ত্তনকারীদিগকে নিম্ন-লিখিত হারে পারিশ্রমিক দিতে হয় :—

	তউরা	মথোলা	তিনকরীদার
পান্না, যাকুত, নীলাম, লালরী, পুখরাথ ইত্যাদি	১১ রতি	॥০ রতি	।০ রতি
গোমেধ	ঐ	ঐ	এরূপ কাটা হয় না।

মূগা কখনও কর্ত্তিত ভাবে আইসে

না। যখনই আইসে তখনই শাখা-বিশিষ্ট আইসে। ইহাকে কাটিয়া হয় দানা নয় তো পলিনারূপে পরিণত করিতে হয়। যাহারা শাখা কাটে, তাহারা তোলা প্রতি চারি টাকা লইয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বে যে সকল মূল্যবান্ প্রস্তরের কথা বলিয়া আসিয়াছি, তাহাদিগের প্রশংসা-সূচক বাক্যও আছে। পান্না সর্ব্বোত্তম হইলে প্রশংসা-সূচক বাক্যে "সব্জে আবের, কাঁচ কা টুকরা", যাকুতকে "সুরখ বে আবের, কবুতরকী আঁখ" অথবা "অভলাস কা টুকরা," নীলমকে "অলসিকা", পুখরাজকে "কুন্দন কী ডালী", লসনীয়াকে "বিল্লিকী আঁখ", মুগাকে "গুলালী দানা," মোতীকে "দুধ কা কেনা, ওসেকী বীন" এবং লালরীকে "গুলাব কী পাত্তী" কহে।

জহরীরা মূল্যবান্ প্রস্তর ক্রয়কালে তাহার বর্ণ, কাট এবং শ্রেণী (বন্দি) দেখিয়া লয় এবং কতদিনে সে তাহাকে বিক্রয় করিতে পারিবে তাহারও আন্দাজ করিয়া ততদিনের টাকার সুদটাও যোগ করিয়া তদুপরি লভাংশ রাখিয়া বিক্রয় করে। সুতরাং ক্রয়কালে জহরীরা যে মূল্যে ক্রয় করে, তাহার দ্বিগুণ দরে বিক্রয় করে।

আমরা পূর্ব্বে মূল্যবান্ প্রস্তর কাটার কথা উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু ছিদ্র করার কথা বলি নাই। যাহারা ছিদ্র করে, তাহারা "বিধিয়া" নামে খ্যাত। ছিদ্র করার মজুরি যথা:—

হীরা ৫ টাকায় রত্তি
পান্না ১ আনায় রত্তি
যাকুত ১ ঐ
নীলম ২ ঐ
পুখরাজ ১ ঐ
গোমেধ ½ ঐ
লালরি ১ ঐ
ফিরোজা ১ টাকায় তোলা
মোতী ৮ আনায় তাঁক (২৪ রত্তিতে এক তাঁক)

এখানে সুগন্ধি দ্রব্য অতি অল্পমাত্রায় তৈয়ার হইয়া থাকে। ফুল ও অন্যান্য বনস্পতি হইতে নির্য্যাস বাহির করিয়া সুগন্ধ প্রস্তুত করা হয়। গোলাপ, কেতকী মুস্তি, মকোই, লবঙ্গ, এলাচ, লেবু ঘাস, পুদিনা, মৌরি প্রভৃতি হইতে আরখ বাহির করা হয়। আরখ বাহির করিতে হইলে যে সকল পাত্রের আবশ্যক তাহার নাম ডেগ, নইচা এবং ভাবকা।

একটা ডেগে তিন ঘড়া জল ধরে কিন্তু তাহাতে দুই ঘড়া জল দিয়া দশ সহস্র গোলাপ পুষ্প ছাড়িয়া দেওয়া হয়। প্রত্যূষে ৬টার সময় হইতে জাল দিতে আরম্ভ করিলে বেলা ৪টার সময় আরখ তৈয়ার হইবে। প্রথম নিষ্কাসিত আরখটা পরদিন পুনরায় চোয়ান হয়, তখন তাহা হইতে ১২ সের নির্য্যাস বাহির হয়। জ্বালানী কাঠ দিলে ৪ মন লাগে এবং তাহার মূল্য বড় জোর এক টাকা, দুই জন লোককে ডেগের তত্ত্বাবধানে রাখিতে হয়। তাহাদিগের প্রত্যেকের মজুরী

দিলে দুই আনা মাত্র। বর্দ্ধমানে ১২৫০ টা ফুলের দাম এক টাকা। যদি মহার্ঘ হয়, তবে ৮০০ ফুলের দাম এক টাকা এবং অতি শস্তা ২০০০ (দুই সহস্র) ফুলের মূল্য ১ টাকা। মোট কথা ১২ সের গোলাপের আরখ তৈয়ার করিতে হইলে সাড়ে দশ টাকা খরচ পড়ে। আরখ বিক্রেতা টাকায় এক সের করিয়া বিক্রয় করে। ইহাতে তাহাদিগের লাভ ১ টাকা ॥৵০ দশ আনা হইয়া থাকে। কেওড়ার আরখ জৌনপুর হইতে আইসে। মুস্তির আরখ ১ আনায় এবং মকোইয়ের আরখ দুই আনায় সের। এলাচের আরখ দুই প্রকারের। বড় এলাচের আরখ ১৬ আনায় এবং ছোট এলাচের আরখ ১৫ টাকায় সের।

নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে মিষ্টান্নই রাজা। এদেশে মিষ্টান্নের প্রকার নিতান্ত কম। বাঙ্গালা দেশে মিষ্টান্নের প্রকার যেমন অধিক, এদেশে তেমন নহে। জিলাবি দুই প্রকারের দেখা যায়। এক প্রকারের নাম জিলাবি ও অন্য প্রকারের নাম "অমৃতি"। বালুসাই, পেড়া, লাড্ডু এই পাঁচ প্রকারের মিষ্টান্নই এদেশে ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যতীত পুরীর ও (লুচীর) মান কম নহে, তবে ইহা মিষ্টান্নের মধ্যে গণ্য নহে। পক্কান্নের মধ্যে ময়রার দোকানে পুরীটি অত্যন্ত আবশ্যক বস্তু। ময়রাগণ এদেশে হালোয়াই নামে খ্যাত। কোন কোন ময়রা মিষ্টান্ন তৈয়ার করিয়া স্বীয় দোকানে বিক্রয় করে এবং কেহ কেহ ফেরিওয়ালা দ্বারা তাহা বিক্রয় করায়। মিষ্টান্নের ফেরিওয়ালাকে এদেশে "খুনচাওয়ালা" বলে। মিষ্টান্ন প্রস্তুতের উপকরণ আটা, চিনি এবং ঘৃত। দশ সের অমৃতি তৈয়ার করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপকরণাদির আবশ্যক।

	টাকা	আনা	পয়সা
ঘৃত ৴২ সের, মূল্য	২	০	০
মাস কলায়ের ডাল ৴২॥০	০	৪	৬
কাশির চিনি ৫সে ১০ছ	১	১৩	২
গন্ধ দ্রব্য	৬	১	০
কাষ্ঠ	০	১	০
মোট	৪	৩	২

ময়রা স্বয়ং বিক্রয় করিলে দেড় টাকায় দুই সের বিক্রয় করে এবং ফেরিওয়ালা দ্বারা বিক্রয় করাইলে সেইটা ১টাকা ১০ আনায় বিক্রয় করিবে।

জিলাবি প্রস্তুতের উপকরণ :—

	টাকা	আনা	পয়সা
ময়দা ২॥০ সের মূল্য	০	৪	০
ঘৃত ২ সের	২	০	০
কাশির চিনি ৫সে ১০ছ	১	১৩	২
গন্ধ দ্রব্য	০	১	০
জ্বালানি কাষ্ঠ	০	১	০
মোট	৪	৩	২

উক্ত উপকরণে ১০ সের জিলাবি প্রস্তুত হইবে।

আমাদের কথা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সরোজিনী।

(১)

আমিই সরলার মেজ দিদি। ছোট বেলায় তাহার গায়ে একখানা গহনা ছিল না। তা না থাকুক—আমার সরলাকে গহনা পরাইবার কোনও আবশ্যক ছিল না। বসন্ত-প্রভাতের ক্ষুদ্র মল্লিকাগুলি যখন ফুটিয়া ফুটিয়া হাসিয়া হাসিয়া তাকাইতে থাকে, সমীরণ আসিলে যখন তেমনি করিয়া হাসিয়া হাসিয়া, হেলিয়া দুলিয়া, মাথা নাড়িয়া বলিতে থাকে :—

দেখ ভাই ছুঁয়ো নাকো,
ছুঁলে আমি বাঁচ্‌বো নাকো,
আস্‌বে আমার ভোমরা বঁধু,
বুকে বসে খুঁজবে মধু,
(শুধু) গন্ধ নিয়ে যাও চ'লে ভাই—
পাবে নাকো আমার মধু!

তখন তা'দের গায়ে কে গহনা পরাইয়া দেয়? তাই বলি আমার সরলাকে গহনা পরাইবার আবশ্যক ছিল না। মনে হইত, সেই ক্ষুদ্র মল্লিকাটিকে যদি সাজ গোজ পরাইয়া ঢাকিতাম, তবে তাহার আর দেখিব কি? সেই ভ্রমর-কুঞ্চিত গাঢ়-কৃষ্ণ কেশ-গুচ্ছ যদি খোপা বাঁধিয়া গোটা কতক কাঁটা ফুল গুঁজিয়া যা-ইচ্ছা-তাই করিয়া ফেলিতাম, তবে আর তার দেখিবার কি রাখিলাম? যদি সেই নবনীত চারু অঙ্গে তুচ্ছ কঠিন কতকগুলা সোণার গহনা চাপাইলাম, তবে তার যে অঙ্গহানি করিলাম। সেই পবিত্র, শুভ্র, স্নিগ্ধ, কোমল, লঘু-সঞ্চারী, প্রকৃতির আদরের সামগ্রীতে কোন্ প্রাণে শিল্পের খাদ মিশাইব?

সত্য সত্যই আমি ইচ্ছা করিয়া সরলার চুল বাঁধিয়া দিতাম না। একখানি ছোট নীলাম্বরী পরিয়া কোঁকড়া কোঁকড়া চুল নাচাইয়া, রৌদ্রের সময় যখন বাগানে ছুটাছুটি করিয়া প্রজাপতি ধরিত, তখন আমি সে কি দেখিতাম? জানি না—বলিতে পারি না, দেখিতে পারি, ভাবিতে পারি, মজিতে পারি, বলিতে পারি না।

কিন্তু হাজার হোক, আমি মেয়ে মানুষ,—রোগ কোথায় যাবে? সরলার বিবাহের সময় সে পক্ষ হইতে অনেক গহনা পত্র আসিয়াছিল, তাহা দিয়া তাহাকে প্রাণ ভরিয়া সাজাইয়াছিলাম। ঘোমটা দিয়া যখন সে শ্বশুরবাড়ী যায়, তখন মনে হইল—এ চাঁদপানা মুখখানি এখন হইতে ঢাকা পড়িল, ভালে হইল, চাঁদের সঙ্গে এখনো এ মুখের তুলনা আছে, কিন্তু কিছু দিন পরে আর থাকিবে না। প্রভাতের বালারুণের

দিকে চাওয়া যায়, কিন্তু মধ্যাহ্ন-কিরণ-ছটায় কাহার না চক্ষু ঝলসাইয়া যায়? তাই ভাবিতেছিলাম,—এ মুখখানা এখন হইতে ঢাকা পড়িল, ভাল হইল!

একটা বড় আশ্চর্য্য দেখিতে পাই। বড় বড় জ্ঞানী দার্শনিক কবিরাও সাধারণতঃ মানুষের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া জড়-প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমার বিশ্বাস তাঁহারা অন্ধ, রূপ দেখিতে তেমন জানেন না! এ বিষয় লইয়া দত্তজার (আমার স্বামীর) সঙ্গে আমার একদিন তর্ক হয়। তিনিই হারি মানেন, শেষে বলেন, "মেয়ে মানুষকে কথায় কে আঁটে?" হইতে পারে, জড়-প্রকৃতির অনেক পদার্থ মানুষ অপেক্ষা সুন্দর, অথবা হয়ত জড়-প্রকৃতির সবই মানুষ অপেক্ষা সুন্দর। কিন্তু আমরা তাহা কি করিয়া জানিব? আমরা যে মানুষ,—মানুষের চক্ষেই দেখি, মানুষের চক্ষে মানুষ অপেক্ষা সুন্দর, মানুষ অপেক্ষা আপনার, মানুষ অপেক্ষা প্রাণের জিনিস আর কি আছে? Man can paint, or make, or think nothing but man." প্রকৃতির সৌন্দর্য্য যতই অধিক হোক, সে জড়, তাহার সঙ্গে তেমন সহানুভূতি আমার কোথা হইতে আসিবে? মনস্তত্ত্বে যাঁহার সামান্য জ্ঞানও আছে, তিনিই বুঝিবেন—সহানুভূতিই প্রেমের অঙ্কুর, স্বার্থ সম্ভাবনায় তাহার পুষ্টি, এবং স্বার্থ সাধনে তাহার পরিতৃপ্তি। তোমার ভালবাসার পাত্রের কণ্ঠস্বর অপেক্ষা মিষ্ট স্বর তোমার কাণে কখনো পৌঁছিয়াছে কি? যদি কেহ বল "আমার কাণে কোকিলের পঞ্চম স্বর অপেক্ষা মিষ্ট স্বর আজিও পৌঁছে নাই," কিম্বা যদি কেহ বল "আমার কাণে ক্লারিয়নেটের কাছে আর কিছু লাগে না";—আমি মুখের উপর বলিব "তুমি কাহাকেও আজিও ভালবাস নাই,—মনের মত মানুষের সঙ্গে আজিও তোমার দেখা হয় নাই। তুমি যাহাকে ভালবাস বলিয়া মনে কর, সে তোমার পাতানো ভালবাসা—প্রকৃতি তাহাতে সাহায্য করে নাই,—সে ভালবাসা লোক-দেখানো, আর নয়তো তোমার ধাঁধাঁ। ভালবাসা বড় সাধারণ কথা নহে, ঐ শোন, যে ভালবাসা জানে, সৌন্দর্য্য চেনে, সে কি গাইতেছে—

ঐই বুঝি বাঁশি বাজে—
বনমাঝে, কি "মনোমাঝে"—

ধন্য রবি! আর তুমি আমাদের বলিয়া আমরাও ধন্য। বাঁশি যে মনোমাঝেই বাজে,—আহা! কেহ কেহ বলেন, অমুক কবি প্রকৃতির সঙ্গে কথা কহিতেন, আমি বলি, ভালই করিতেন। কিন্তু যদি বল, মানুষ অপেক্ষা জড়-প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর অধিক বনিবনাও, অধিক মাখামাখি ছিল, তবে বলিব, হয় তিনি সিদ্ধ-পুরুষ, নয় মানুষের দিকে তাঁর দৃষ্টিই নাই—বুঝি মনের মানুষ কপালে জুটে নাই! মানুষকে তিনি অন্যায় অবহেলা করেন।

হায়! এই জন্যই বুঝি মানুষকে অসুন্দর দেখিলে বড় দুঃখ হয়। মনে হয় এর চেয়ে অসুন্দর আর বুঝি প্রকৃতিতে কিছু নাই,—এ বুঝি অস্বাভাবিক! এ বুঝি অপ্রাকৃতিক! লেডিক্যানির ছানাটায় একটু ধরা গন্ধ হইলে বড় দুঃখ হয়,—মনে হয়, এর চেয়ে বুঝি নারিকেলের নাড়ুও ভাল।

ভগ্নীরা অনেকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "ভাই, তোমার নিজের খবর কি?" সে কথা রত্নাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার, আমার এত খবরে কাজ কি? পারতো তোমরাই একবার আয়নার সম্মুখে যাও।

(২)

আমার মল্লিকা ফুলের কথা অনেক বলিয়াছি, ভোমরার কথা বলি নাই—আর সে কথা তুলিতে ইচ্ছা করে না, সবই তো ফুরাইয়াছে।

পাখনা থাকিলেই ভ্রমর হয় না। কিন্তু যিনি আমার সরলার সর্ব্বনাশ করিয়া গেলেন (এ কথা সহস্রবার বলিব) তিনি রঙে ভোমরাই ছিলেন বটে। তিনি বিবাহ করিতে আসিলে থুলী-ঠান্ দিদি বলিয়াছিলেন—

ওলো সেজেছে ভাল,
রাই আমাদের কাঁচা সোণা
শ্যাম চিকণ কালো।

আর বাসরঘরে বলিয়াছিলেন "নাত জামাইয়ের কোলে সরলাকে বসিয়ে দিলে দেখাবে যেন গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে।"

তিনি পুরুষ মানুষ এবং অধুনা স্বর্গে গিয়াছেন, তাঁর কথা আমি কিছু আর বলিব না, বিশেষ আমি স্ত্রীজাতি, পুরুষের দোষ গুণ, ভাল মন্দ দেখিবার আমি কে?

কিন্তু এখন এ কি হইল? আমার বড় সাধের, বড় আদরের সরলার আজ এ কি সর্ব্বনাশ হইল? আমি এখন কি করিব, কোথায় যাইব, কি করিলে কি হইবে, কিছুই যে বুঝিতে পারিতেছি না। আজ তিন দিন সে বাড়ীতে আসিয়াছে। কিন্তু সেই প্রথম দিন বাড়ী গিয়াছিলাম, আর একটিবারও যাই নাই। তার দিকে আমি আর চাহিতে পারি না, সে যে রাত্রিদিন আমার বাড়ী আসিয়া দুরন্তপনা করিত, কিন্তু আজ তিন দিনের মধ্যে একটী বারও বাটীর বাহির হয় নাই। দত্তজা একবারও সেখানে যান নাই, বলেন, "আমি গিয়া সরলার সম্মুখে কেমন করিয়া দাঁড়াইব? সরলার সঙ্গে চোখোচোখী হইলে আমি কি করিব, কি বলিব, আমি জানি না।" এখন উপায়?

দেখিতেছি যত ঝুঁকী আমারই ঘাড়ে পড়িবে। যার অসুখ, তার উপর এই দারুণ শেল বুকে বিঁধিল, তিনি যে এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন, এমনতো বুঝি না। বাবাও বৃদ্ধ হইয়াছেন, তার উপর হাঁপের অসুখতো আছেই,—কখন কি হয়,—তিনিই বা আর কত দিন। তার পর? প্রফুল্ল আজও ছেলে মানুষ, বৌটিতো হাবা গোবা। ওদিকে নষ্টামিটুকু বিলক্ষণ

আছে, তার উপর গুমোরে মাটিতে পা দেয় না,—বড় মানুষের মেয়ে, তবে আর কি? আমার ভাই নাকি বড় ভাল ছেলে, তাই অত শোভা পেয়ে যায়। আমার এমন সোনার চাঁদ ভাইয়ের কপালে কিনা এই ছিল! তবু যদি ছুঁড়ী দেখ্‌তে শুন্‌তে একটু মানুষের মত হইত,—তা না, কে বলিবে কায়েতের মেয়ে, নাম রাখিতে তো পয়সা লাগে না,—লাগিলেও বুঝি আটক থাইত না,—নাম রাখিয়াছে পদ্মমুখী! তাই খুদী ঠান্ দিদি ঘোমটা খুলিয়া বৌ দেখিয়া যখন শুনিলেন বড় মানুষের মেয়ে, তখন ছুটিয়া দালানে গিয়া প্রফুল্লের শ্যালককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"হাঁগা, তোমরা কয় পুরুষ বড় মানুষ হ'য়েছ গা?" ছেলেটি তাহাতে বড় রাগ করিয়াছিল।

সংসারের তো এই দশা, এখন আমি সরলাকে নিয়ে কি করি? এ আগুনের ফুলকি এখন আমি কোন্ আঁচলে বাঁধিয়া রাখিব? সবেতো প্রাতঃকাল, সম্মুখে সমস্ত দিন পড়িয়া রহিয়াছে, বাছাকে আমি কোন প্রাণে, কেমন করিয়া, কতদিন, সিন্দুকে চাবি দিয়া রাখিব? তাহার সম্মুখে আমি কেমন করিয়া অলঙ্কার পরিয়া, বারাণসী পরিয়া, লোকের বাড়ী বিবাহে আমোদ করিতে যাইব? সরলারে! আজ তোর জন্ম বুঝি আমায় পাগল হইতে হইবে।

মা ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন,—একবার যাইব, প্রফুল্ল কাল বাড়ী আসিবে, বৌকে আনিতে লিখিয়াছি, দেখি কি করে, ছুঁড়ীকে দেখ্‌লে আমার আপাদমস্তক জলিয়া যায়। আহা, সত্যি তাড়াতাড়ি বাবা সরলার বিবাহ দিলেন, বৌটাকে পর্য্যন্ত একবার আনিবার সময় হইল না। প্রফুল্লতো রাগ করিয়াই বাড়ী আসে নাই।

৩

কাল মার কাছে গিয়াছিলাম, তিনি অনেক কান্না কাটি করিলেন। তিন দিন যাই নাই বলিয়াই ডাকিতে পাঠাইয়াছিলেন, আজ দুপুরের গাড়ীতে প্রফুল্ল আসিয়াছে, বৌকেও সঙ্গে আনিয়াছে। ডাক্তারীর শেষ পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছে, মাসখানেক পরে পরীক্ষার ফল বাহির হইবে, দেখি ঈশ্বর কি করেন, প্রফুল্ল দু'পয়সা আনিতে পারিলে বাবার দুঃখ ঘোচে। হায়,—সরলার মুখের দিকে চাহিলে সব সুখ, সব আশা যে ভাঙ্গিয়া যায়!

সরলার মুখে আর সে হাসির জ্যোৎস্না নাই—

"সে হাসি আনন্দ, আনন্দ সে ভাষা
কাঁদিতেও হাসি অশ্রুতে ভাসে
অভিমানভরে কাঁদে যদি বালা,
কোথা হাসি যেন লুকায়ে হাসে—।"

সে হাসি সে মুখে আর নাই,—বুঝি আর ফিরিয়া আসিবে না। চোখে যেন আর সে চাঞ্চল্য নাই, সর্ব্বাঙ্গের সেই তাড়িৎ সঞ্চালনের ভাব আর নাই, হস্তপদের আর সে ক্ষিপ্রতা নাই, সবই যেন ঠাণ্ডা, যেন ছোট নদীটিতে কুল কুল

বন্যার জল আসিতেছিল, নদীটা আহ্লাদে আটখানা হইয়া তরঙ্গ তুলিয়া, দুলিয়া দুলিয়া, ফুলিয়া উঠিতেছিল, হঠাৎ কে যেন গোড়ায় বাঁধ দিয়া ফেলিল, জল থমকিয়া থাইল, স্রোতের মুখে যাহা যাহা ভাসিয়া আসিতেছিল, সব যেন যে যেখানে ছিল সেই খানেই দাঁড়াইয়া গেল। শারদ প্রাতের স্বচ্ছ শ্যামল প্রকৃতির গায়ের উপর প্রভাত-রৌদ্রের হাসিটুকু ফুটিয়া উঠিতেছিল, হঠাৎ যেন কোথা হইতে অসময়ে একখানা কালো মেঘ ছুটিয়া আসিয়া প্রভাকরকে ঢাকিয়া ফেলিল। প্রকৃতি-সুন্দরীর সুন্দর মুখের হাসিরাশি মুখেই মিলাইয়া গেল, করাল ম্লান ছায়া সে হাসি ঢাকিয়া ফেলিল। বেলের কুঁড়িটী সবে বুক ফুলাইয়া উঠিতেছে, ফোটে ফোটে, কে যেন তার বোঁটা শুদ্ধ ছিঁড়িয়া তপ্ত বালুকাস্তূপের উপর নিক্ষেপ করিল।

সরলা আস্তে আস্তে আমার কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িল, সে বাবার থান কাপড় লইয়া পরিয়াছে। হাতে এক গাছি কাঁচের চুড়ী পর্য্যন্ত রাখিতে দেয় নাই, চুলের রাশি রুক্ষ, আলুলায়িত, মুখখানি ম্লান, গম্ভীর,—যেন অভিমানে ভরা—শুধু অভিমানে। কিন্তু সেই বালিকার মুখে যে গাম্ভীর্য্যটুকু সে দিন দেখিলাম, তাহাতে আমার যুগপৎ ভয়, বিষাদ ও বিস্ময়ের উদ্রেক হইল। মনে হইল সেই বয়সে সে গাম্ভীর্য্য কেবল হিন্দুর মেয়ের ভিন্ন পৃথিবীতে আর কাহারো মুখে সম্ভবে না। যখন দূর আকাশের এক পার্শ্বে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ঘন মেঘ উঠে, আর তার গায়ে সরু সরু ঝিক্‌মিকে বিদ্যুল্লতা মাঝে মাঝে ছুটাছুটী করিতে থাকে, তখন যদি অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, একটী পরিত্যক্ত বাস্তুভূমির উপরিস্থিত ফুল-ভরা বক ফুলের গাছের দিকে চাহিয়া থাক, তবে বুঝিবে সরলার এখনকার মুখের ভাব কেমন,—ঠিক তাহারই একটী একটি ফুলের মত। তাহাকে দেখিয়া আমার হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া যাইতে লাগিল। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলাম, "জগৎপিতঃ, তোমার সৃষ্টির এই সোনার প্রতিমাখানি বোধনের রাত্রে কে বিসর্জ্জন দিল, নাথ!" সত্য বলিতেছি, আমার অন্তরের অতি গূঢ়াদপি গূঢ় অন্তর হইতে, সেই পরমাত্মা যেন আমার জীবাত্মা ভেদ করিয়া উত্তর করিলেন, "তোমরাই"। কিছুক্ষণের জন্য যেন বাহ্যজ্ঞান হারাইলাম, যেন পঞ্চেন্দ্রিয় একীভূত হইয়া কর্ণে পরিণত হইল, আর তাহার মধ্যে যেন সেই স্বর্গীয় বাণী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—"তোমরাই।" আমাদের সুখ দুঃখের কারণ আমরাই! —তোমার তবে হাত নাই নাথ!

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখি, কোলের কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে। সরলা আমার কোমর দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া আমার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া, ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেছে, আলুলায়িত, অযত্ন-বিন্যস্ত চুলের রাশি মেজের উপর ছড়া ছড়ি হইতেছে। আমি তাহাকে সাদরে তুলিয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলাম,

তাহাকে কোলে করিয়া বসিয়া দুই বোনে প্রাণ ভরিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলাম। অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলাম না। কি ছাই কথা কহিব? তখনকার মনের ভাবের কি ভাষা আছে? দুই বোনে মুখে মুখে, বুকে বুকে, প্রাণে প্রাণে মিশিয়া প্রাণের ব্যথায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম। তার মাঝে কি কথা আসে? তার কি ভাষা আছে?—"ভাষা তার নীরবতা।" একটু সম্বরণ করিয়া সরলার চক্ষের জল মুছাইলাম, নিজেরও মুছিলাম, তার ক্ষুদ্র মুখখানিতে কতবার চুম্বন করিলাম, সে কেমন আস্তে আস্তে উঠিয়া আমার নিকট হইতে চলিয়া গেল।

৪

সরলা চলিয়া গেল। আমি কিছু বলিলাম না, তার সঙ্গে একটীও কথা হইল না, নীরবে আমার কাছে আসিল, নীরবে কাঁদিল, নীরবে উঠিয়া গেল। গমন ধীর, মন্থর, দৃঢ়পাদবিক্ষেপ। এখনো তিন মাস হয় নাই, একদিন মার কাছে কি লইয়া আব্দার করিয়া কাঁদিয়া পাড়া মাথায় করিয়াছিল, হাত পা ছুঁড়িয়া দুই হাত পোরা কাঁচের চুড়ী কুচি কুচি করিয়াছিল,—সে যে মার কোলের মেয়ে।

তোমরা বলিবে, "বোনের কাছে আসিলে, তাকে এ সময় একটু সান্ত্বনা করিলে না?" সত্য বটে, কিছু বলা উচিত ছিল, অনেক কথা বলিবারও যেন ছিল, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া সব ভুলিলাম। মুখে কথা ফুটিল না। আমার হৃদয়ে যদি একটী বৃশ্চিক দংশন করে, বিষের জ্বালায় আপাদমস্তক জ্বলিতে থাকে, যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া পড়িয়া থাকি, তখন যদি কেহ আদর করিয়া বলিতে আসেন, "আহা লাগে নাই, অমন কত লোককে কামড়ায়, ঐ যে সে দিন অমুককে কামড়াইয়াছিল" ইত্যাদি, তাহাতে আমার কি হয়? বরং যদি কেহ একটু ঔষধ লেপিয়া দেন, তাহাতে শান্তি লাভ করি। কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রসূন-কোরকে আজি যে সহস্র বিষ-দংষ্ট্র কীট প্রবেশ করিয়াছে, তাহার মর্ম্মচ্ছেদী যন্ত্রণায় কি ঔষধ লেপিতে হয় আমি যে তাহা জানি না, আমি তাকে কি বলিব, কি বুঝাইব, কি সান্ত্বনা দিব? যদি একটু উষ্ণ অশ্রুবারি-সেকে কোনো উপকার হয়,—তার তো ত্রুটি করি নাই। তার অশ্রুবারি সনে আমার অশ্রুবারি মিশাইলে যদি কিছু উপকার হয়, তাহাও মিশাইয়াছি,—আর কিছু পারি নাই, কিছু বুঝি নাই!

আর একটি কথা, সরলার মুখের সেই গাম্ভীর্য্য, সে গাম্ভীর্য্যের সম্মুখে আমি যেন কতটুকু,—তাকে আমি কি বুঝাইব? সে বুঝি এই দুদিনের ভিতর কত বুঝিয়া ফেলিয়াছে, আমার চেয়ে কত জ্ঞান, কত বহুদর্শিতা লাভ করিয়া ফেলিয়াছে,—নহিলে ও মুখে তবে আজ এ কিসের ছায়া? আমি যেন কথা

বলিতে সাহস করিলাম না। কি বলিতে হয় তো কি বলিব? যখন কাঁদিতে আরম্ভ করিল, বৃষ্টিবর্ষণে যখন মেঘের কালো রং একটু পাত্‌লা হইয়া আসিল, তখন বরং একটু সাহস পাইলাম, কিন্তু সে যখন আপনা হইতেই ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল, আমি কিছু বলিতে পারিলাম না। ভাগ্যে দত্তজার অনুগ্রহে একটু সামান্য শিক্ষা পাইয়াছিলাম, ভাগ্যে মনের একটু প্রশস্ততা লাভ করিয়াছিলাম, একটু হিসাব করিয়া কাজ করিতে শিখিয়াছিলাম,—নহিলে বুঝি পরের মত তাহার সঙ্গে কত 'লোকুতো' করিয়া ফেলিতাম। সে যে আমার আপন,—এক বৃন্তের ফুল।

আমি অধিকক্ষণ সেথানে অপেক্ষা করিতে পারিলাম না, চিত্ত বড় অস্থির, কিছুক্ষণ নির্জ্জনতা চাই। প্রফুল্লকুমারকে একটু আদর করিয়া, বৌকে একটু কাটে আপ্যায়িত করিয়া বাড়ী চলিলাম। সেথানে দত্তজা আছেন, নির্জ্জন আছে, তাই শান্তিও আছে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম এ।

(ক্রমশঃ)

অশোক ফুল।

১

আজি মোর অশোক কাননে
গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়াছে ফুল,
চারি ধারে রক্তিম উচ্ছ্বাস
সারা প্রাণ উদাস আকুল!

২

একদা এ অশোকের মূলে,
কথা হায়, সেই কবেকার—
আঁখি-কোণে হৃদয়-শোণিত
উথলিল বন্দিনী সীতার!

৩

মনে হয় পুষ্পরূপে ওই
অশ্রু তাঁর উঠেছে ফুটিয়া,—
মর্ম্মভেদী তপ্ত দীর্ঘশ্বাস
পত্রে পত্রে ফিরিছে কাঁদিয়া!

৪

জন্মান্তের অতৃপ্তি লইয়া
প্রায়শ্চিত্ত করে দশানন,
পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমরের বেশে
ক্ষমা-আশে করিছে গুঞ্জন!

৫

সতী সাধ্বী ভারত-রমণী,
তোমারি অপূর্ব্ব ইতিহাস
লিখিত এ অশোকের দলে
সত্য ধ্রুব দীপ্ত অবিনাশ!

৬

বঙ্গ-কবি সজল নয়নে
মালা ছলে বন্দনা তাহার
গাঁথি তাই এনেছে যতনে
লও দেবী লও উপহার!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

শিল্প শিক্ষা।

বিলাতে ইংরাজ মহিলাদিগের জন্য প্রকাশিত মাসিক পত্রিকায় শিল্প বিষয়ে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক মাসে নূতন নূতন জামায় কাট, ক্রুশের সেলাইয়ের নমুনা, কাটির কাপড়ের উপর ফুল পাতা তুলা, প্রভৃতি নানা বিষয়ের নমুনা ও প্রস্তুত-প্রণালী প্রবন্ধাকারে লিখিত হয়। ইহাতে সকল শ্রেণীর ইংরাজ মহিলাগণের শিল্পশিক্ষার অত্যন্ত সুবিধা হয় এবং ব্যয়ও কমে।

যাহাদের পৃথক্‌রূপে শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া বা স্কুলে যাইয়া শিল্পকার্য্য শিখিবার সুবিধা নাই, কিম্বা যাহাদের নূতন কোন শিল্প শিখিবার ইচ্ছা হয়, তাহারা একখানি মাসিক পত্রিকা চারি আনা কি আট আনা দিয়া ক্রয় করিলেই গৃহে বসিয়া অন্যের সাহায্য ব্যতীত তাহা শিখিতে পারিবেন, ইহাতে কত সুবিধা।

আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজ মহিলাদিগের ন্যায় শিল্পশিক্ষার আদর দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে! অনেকেই শিল্প শিখিবার জন্য বিশেষ ইচ্ছুক, কিন্তু আমাদের দেশের মাসিক পত্রিকাগুলিতে এ বিষয়ে শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা নাই। মহিলাদিগের প্রকাশিত মাসিক পত্রিকায় যদি ঐরূপ ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে অন্তঃপুরস্থ রমণীগণের পক্ষে শিল্পশিক্ষার বিশেষ সুবিধা হয়।

অধুনা আমাদের দেশে শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে পরিচ্ছদের বাহুল্যও হইয়াছে। রমণীদিগের পরিধানোপযোগী আবশ্যক পরিচ্ছদগুলি যদি তাঁহারা স্ব স্ব হস্তে প্রস্তুত করিয়া লইতে সক্ষম হন, তাহা হইলে আমাদের এই দরিদ্র দেশের গৃহস্থগণের অনেক ব্যয়সংক্ষেপ হইতে পারে। অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগের শিক্ষার সুবিধার জন্য গত চৈত্র মাসের পত্রিকায় জ্যাকেট কাটিবার প্রণালী ও তাহার নমুনা প্রকাশিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে রমণীদিগের আগ্রহ দেখিলে পরে অন্যান্য বিষয় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল। এক্ষণে এ বিষয়ে রমণীদিগের আগ্রহ আছে জানিয়া আর একটী নমুনা প্রদত্ত হইল। ইহার প্রস্তুত প্রণালী ও কাটিবার প্রণালী জ্যাকেটেরই ন্যায়। কেবল প্রভেদ এই যে, জ্যাকেটের বোতাম সম্মুখ দিকে হয়, ইহার পৃষ্ঠের দিকে হয়। ইহাকে ইংরাজিতে "ব্লাউস" বলে। ব্লাউসের কাট জ্যাকেট হইতে সহজ এবং ইহাতে কাপড়ও কম লাগে। জ্যাকেট তৈয়ার করিতে যদি বড় বহরের দেড় গজ কাপড় লাগে, একটী ব্লাউস করিতে সে স্থানে এক গজ কাপড় হইলেই হইবে, ইহাতে কত সাশ্রয়।

ব্লাউস কাটিবার নিয়ম—

জ্যাকেট যেরূপে কাটিতে হয়, ব্লাউসও সেইরূপেই কাটিতে হয়, কেবল জ্যাকেটের দুই পার্শ্বে দুইটী স্বতন্ত্র কাট

কাটিতে হয়, ইহাতে তাহা হয় না। বুকের সঙ্গে একবারেই সেই কাট কাটা হইয়া যায়। বুক, পিঠ ও হাত এই কাটিলেই হইল। ইহার সহিত যে কাটের নমুনাটী দেওয়া হইল, তাহা দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।

ব্লাউস সেলাই করিবার নিয়ম—

প্রথমতঃ বুকের পার্শ্বের (যে দিক কোর করিয়া কাটা) (১) চিহ্নিত কাটের সহিত পিঠের (যে দিক কোর করিয়া কাটা) (১) চিহ্নিত কাটের সেলাই করিতে হইবে। পরে দুইটী কাঁধের (২) চিহ্নিত কাটের সহিত সেলাই করিয়া (৩) চিহ্নিত হাতের গর্ত্তের সহিত (৩) চিহ্নিত হাত সেলাই করিলেই একটী সম্পূর্ণ ব্লাউস তৈয়ারী হইবে।

নিজ নিজ রুচি অনুসারে ইহার বুকে, হাতে, গলায় চিকন্ কিম্বা লেস, পাড়, প্রভৃতি বসাইয়া লইলে দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর হইবে।

গৃহকর্ম্ম।

জারক লেবু।

এদেশে এ সময় পাতিলেবু খুব সস্তা হয়। পাতিলেবু পেটের পীড়ায় পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। এই সময় অনেক গৃহস্থের বাটীতে পাতিলেবু জরাইয়া রাখা হয়। এই জরান লেবুকে "জারক লেবু" বলে। এই জারক লেবু অজীর্ণ, গা বমি, অরুচি প্রভৃতির পক্ষে বড়ই উপকারী।

জারক লেবু প্রস্তুত করিবার নিয়ম—

যদি একশত পাতিলেবু জরাইতে হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ সে গুলিকে উত্তম করিয়া শিলে ঘসিয়া লইতে হইবে (তাহার গায়ের উপরকার রং যেন না থাকে, আর ভিতরের কোয়া যেন বাহির হইয়া না পড়ে এইরূপে ঘসিয়া)। পরে সেই ঘসা লেবুগুলি পরিষ্কার জলে ধুইয়া একটী মাটী, পাথর কিম্বা কাচের পাত্রে লেবুগুলির ডুবিবার মত জল দিয়া তাহাতে /॥০ অর্দ্ধসের লবণ মিশ্রিত করিয়া সেই লবণ-জলে ঐ লেবুগুলি ফেলিয়া দিয়া উহার উপরে পুনরায় অর্দ্ধসের লবণ ছড়াইয়া দিয়া চাপা দিয়া রাখিতে হইবে। আট নয় দিন পরে লেবুগুলি যখন বেশ নরম হইয়া যাইবে, তখন অন্য একটী পাত্রে ৩০টা বড় বড় পাতিলেবুর রস গালিয়া তাহাতে অর্দ্ধপোয়া আন্দাজ লবণ মিশ্রিত করিয়া সেই রসে লবণ জল হইতে লেবু গুলি তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। ১৫।১৬ দিন পরে রস হইতে লেবুগুলি তুলিয়া রৌদ্রে দিয়া শুখাইয়া লইলেই জারক লেবু প্রস্তুত হইল। একটী বড় শিশিতে করিয়া এই লেবুগুলি বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকিবে।

ধাঁধাঁ।

১। এমন কি প্রাণী আছে চলে চতুষ্পায়।
দুই প্রহরেতে নহে কিন্তু morning সময়॥
হইলে দুপ্রহর Time ছুটী পাও দিয়া।
যথা ইচ্ছা চলে যায় আহ্লাদিত হইয়া॥
আসিয়া পড়িলে End তিন পদ পরে।
ধীরে ধীরে চলে যায় যে বা যত পারে॥

২। এমন কি আছে যার অবয়ব নয়।
না থাকে ভূমিতে এবং আকাশেও নয়।
কিন্তু সে ত মানবের করে রক্তপান।
কিবা তার নাম হয় বল বিজ্ঞবান॥

সংবাদ।

১। লণ্ডনে ১৭ই জুলাই ইংরাজ রমণীগণ এক মাইল দীর্ঘ এক মিছিল বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহারা ১২৫ দলে বিভক্ত হইয়া ১২৫টী পতাকার তলে দণ্ডায়মান ছিলেন। পতাকাতে এই সকল কথা লিখিত ছিল "পুরুষেরা যুদ্ধ করিবে, নারীরা কর্ম্ম করিবে", "আমরা অক্ষম নহি," "আমরা দেশ রক্ষা করিতে ও জর্ম্মণ সম্রাটকে তাড়াইয়া দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছি," "আমরা চাই যে যুদ্ধের জন্ত সকলকেই কর্ম্মে নিযুক্ত করা হউক"। মিঃ লয়েড জর্জ্জ নারীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন "৫০ হাজার স্ত্রীলোক এখন গোলার কারখানায় কর্ম্ম করিতেছেন। নারীদিগের সাহায্য ব্যতীত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে বিলম্ব হইবে। স্ত্রীলোকেরা শত্রুজয়ে আমাদের সহায় হউন।"

২। দিল্লীতে লেডি হার্ডিং মেডিকেল কলেজের বাটী নির্ম্মাণ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আগামী শীতকাল হইতে কলেজের কার্য্য আরম্ভ হইবে। ভারতবর্ষের সমুদায় স্থানের নারীগণ এই কলেজে এম, বি, পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইতে পারিবেন।

৩। স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি সাধনের জন্ত সম্প্রতি লণ্ডনে এক সভা হইয়াছিল। সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের প্রতি ১০ লক্ষ স্ত্রীলোকের মধ্যে ৩৯১০ জন স্ত্রীলোক মাত্র লেখাপড়া শিখিতেছে। ভারতে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্ত ভূতপূর্ব্ব সিবিলিয়ান মিঃ ইয়ুসুফ আলির প্রস্তাবে ও লর্ড লিটনের কন্যা লেডী লুটেন্সের সমর্থনে ভারতসচিবের নিকট এক দরখাস্ত প্রেরণের প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে।

৪। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার বাণিজ্য বিভাগের বাটীতে স্থায়ী রূপে শিল্পপ্রদর্শনী স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

বি, এ, পরীক্ষার ফল ।

ইংরাজি অনার ।

প্রথম বিভাগ ।

১ । মলি কোহেন—ডাওসেসন ।

দ্বিতীয় বিভাগ ।

২ । র‍্যাচেন আবটেন—ডাওসেসন ।

৩ । গুহ কিটি— "

দক্ষতার সহিত উত্তীর্ণ ।

৪ । শারঙ্গী চন্দ্রমুখী—বেথুন ।

পাশ লিষ্ট ।

৫ । বসু বিভাময়ী—বেথুন ।

৬ । দাস স্বর্ণলতা—প্রাইভেট ।

৭ । মুখার্জ্জি শোভা—"

৮ । পাল অমরবালা—"

৯ । রায় চারুশীলা—বেথুন ।

১০ । সিংহ রায় সুষমা—প্রাইভেট ।

১১ । সরকার হেনরিয়েটা অবলাবালা ডাওসেসন ।

১২ । তৈজোময়ী—" "

১৩ । সফিয়া কাজি—প্রাইভেট ।

বামারচনা ।

(১) সতীদেহত্যাগে ।

হের বিশ্ববাসী, প্রেম অবিনাশী,
মরি কি মধুর মহেশহৃদয়ে ।
হারা হ'য়ে সতী, আজি পশুপতি,
ভ্রমে ত্রিভুবন উন্মত্ত হইয়ে ॥
বিহীন চেতন, অবশ পরাণ,
দেব দিগম্বর বাহ্যজ্ঞানহীন ।
সতি সতি স্বর, রব নিরন্তর,
বদনমণ্ডলে করি উচ্চারণ ॥
বিগলিত প্রাণ সতী শোভাহীনা,
তথাপি ত্যজিতে নারি কদাচন ।
নিজ অংসোপরে শব তনু ধরে,
উন্মত্ত অধীর করে বিচরণ ॥
এ স্নেহ মমতা, এ উচ্চ প্রাণতা,
কে হেরেছে কোথা এ ব্রহ্মাণ্ডময় ।
বিনা সতীশ্বর, পবিত্র শঙ্কর,
অন্য কোন দেবে অধিকারী নয় ॥
শুন দেব দেব শিবময় শিব,
তোমার চরণে এই নিবেদন ।
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে, এ প্রেম অমরে,
বিতরিয়ে দেহ প্রণয়সম্মান ॥
কায়া মাত্র ভেদে নাহি ত্যজি হৃদে
প্রণয়-প্রতিমা করিয়া গঠন ।
ধরিয়া জীবনে প্রণয় স্মরণে,
নরগণ হেন রহে অনুক্ষণ ॥
ভ্রান্তমতি নর ধর অতঃপর
প্রেম অনশ্বর ঈশান সমান ।
আবার মিলনে অনন্ত বন্ধনে
পরলোক মাঝে রবে অনুক্ষণ ॥

শিব-সাধনা।

ধরি যোগাসন দেব ত্রিলোচন,
এ কঠোর তপ করিতেছ কার?
নিমীলিত আঁখি, মেলি দেখ দেখি,
সাধনার ধন সম্মুখে তোমার॥
পাদ্য অর্ঘ লয়ে, আছে দাঁড়াইয়ে,
এলায়িত চারু চিকুরের ভার।
অষ্টম বরষে, পঞ্চতপা ক্লেশে,
হইয়া গো উমা কঙ্কালের সার॥
বল্কলবসনা, আভরণহীনা,
বিভূতিভূষণ হইয়াছে গায়।
কমল-নয়ন করি উন্মীলন,
দাও গো তাহারে স্ববাঞ্ছিত বর॥
অমর বৈভব চাহে না সে সব,
শিবত্বে পরাণ করিয়া যে লয়।
বিজন কাননে, শুধু তব ধ্যানে
এ কনক-বল্লরী কালিমাময়॥
হয়ে রাজবালা, কত সবে বালা,
ক্লিষ্ট তনু অতি হইয়াছে তার।
পুরাও অভীষ্ট, প্রদানিয়ে ইষ্ট,
নতুবা কলঙ্ক তব গঙ্গাধর॥
মনোমত পতি চাহে হৈমবতী,
অভেদ প্রণয় হইবে তাহার।
অচ্ছেদ্য বন্ধনে রহিবে দুজনে,
এই গো হৃদয়ে বাসনা সায়॥
মানস মূরতি দেব পশুপতি,
ক্ষণমাত্র কাল করি পরিহার।
গিরি কুমারীরে, হৃদি-পরে ধরে,
সফল করহ শিব-সাধনার॥

অজ-বিলাপ।

জাগো ইন্দুমতি কাঁদে প্রাণ অতি
এ ভাবে তোমারে হেরিয়ে।
নিমীলিত আঁখি, কেন বিধুমুখী,
সহসা ভূতলে পড়িয়ে॥
কোমল পরাণে, কি ব্যথা বাজিল,
কি ব্যথা পশিল মরমে।
জনমের তরে, ছাড়িয়ে অজেরে,
রহিলে কেন ঘোর ঘুমে॥
নন্দনের সার, পারিজাত হার,
পরশে তাহার চেতনা।
না জানি কি ছলে, হরিল অকালে
প্রাণাধিকে কিছু বুঝি না॥
অথবা মলিনী, নীহারে নলিনী,
বুঝিবা তেমনি হইল।
কোমল বস্তুর নিধনে বিধাতা
কোমল বস্তুই সৃজিল॥
এ ঘোর যাতনা, আরতো সহে না,
ধৈরয ধরিতে না পারি।
উঠি মেল আঁখি, কাতরেতে ডাকি
জীবনের সহচরি!
নয়নের তারা, অমৃতের ধারা,
এ মম হৃদয়-মরুতে।
জীবন-সঙ্গিনী, সন্তাপহারিণী,
তব সম কেবা ধরাতে॥

গৃহে যে গৃহিণী, লক্ষ্মীস্বরূপিণী
প্রিয় সখী প্রেমালাপে।
কলা বিদ্যার স্থলে, ছাত্রী সম ছিলে,
পরামর্শে মন্ত্রিরূপে॥
বীণাধ্বনি শুনি, সুধামাখা বাণী,
না শুনি হৃদয় বিদরে।
উঠ প্রিয়তমে, ত্যজি ঘোর ঘুমে,
বারে বারে ডাকি কাতরে॥
এ ভাবেতে করে, অকালেতে হরে,
ওরে কাল দুরাচার!
কি নাহি হরিলে বল, বিদারিয়া বক্ষঃস্থল,
তুই রে আমার॥

ইন্দুবালা।

দানব-নন্দিনী, দানব ঘরণী
হয়ে তুমি ইন্দুবালা।
পুষ্প সুকোমল, সম হৃদিতল,
কোথা হতে পেলে বালা॥
শত্রুর কারণে, সদা আঁখিকোণে,
বহে অশ্রু দর দর,
পাছে পতি-শরে, কোন নারী ধরে
দারুণ বিরহভার॥
রূপে নিরুপমা, মাধুরী মনোরমা,
না দেখি দানবকুলে।
রুদ্রপীড় সম, যোদ্ধা অনুপম,
বাঁধা তাই হৃদিতলে॥
বীর-রণ-শ্রম, করিতে উপশম,
এ চারু রতন হারে।
বিধি নিজগুণে, অর্পিলা যতনে,
রুদ্রপীড়-বক্ষোপরে॥
ধন্য রুদ্রপীড় অরিন্দম বীর,
বিজয়ী দানবকুলে।
দেবতাবাঞ্ছিত, হেন পারিজাত,
শোভিছে যাহার গলে॥

শ্রীস—বিশ্বাস।
কলিকাতা।

উষা।*

(১)
প্রাণ-মন-হরা উষা মনোহরা
পূরব আকাশ হতে,
ধীরে ধীরে ধীরে মানবের তরে
নামিল 'সেফালি' প্রাতে।

(২)
আলোকপরশে মধুর বাতাসে
তারাগুলি নিবে যায়,
এদিক্ ওদিক্ খুঁজি চতুর্দ্দিক
আঁধারে তাড়ায়ে ধায়।

(৩)
নিদ্রা ত্যজি বালা হাতে লয়ে ডালা
কুসুমচয়নে যায়,
ফুলের সুবাসে প্রেমের আবেশে
'জয় জগদীশ' গায়।

* ১১ বৎসরের বালিকা কর্ত্তৃক লিখিত।

(৪)
পাখী গাছে গান তুলিয়া সুতান
মধুর মধুর প্রাতে,
জয় জগদীশ কয়হে আশীষ
প্রণমি হে বিশ্বপতে।
(৫)
সিক্ত বসনে কমলা ভূষণে
স্নান করি যায় সতী,
গুণগুণ গায় জগদীশ জয়
হরষিত মনে অতি।
(৬)
কানে কানে কয় 'শিহরি' মলয়
জয় জগদীশ গাথা,
সাধনা আমার আশীষ তাঁহার
নত করে দেয় মাথা॥

শ্রীমতী শশীলতা দেবী।

সুশিক্ষা।

বিনয় ভূষণ, সুমিষ্ট বচন,
সলজ্জ সরল হাসি।
পরম সুন্দর, জন মনোহর,
সদ্‌গুণ শোভারাশি।
প্রসন্ন নয়ন, প্রসন্ন বদন,
প্রশান্ত হৃদয়ভার।
গর্ব্ব নাহি জানে, হিংসা নাহি প্রাণে,
না জানে কপটাচার।
সেবে গুরুজন, ভকত সজ্জন,
অতিথি দেবতা জ্ঞানে।
প্রফুল্ল অন্তরে, মিষ্ট শিষ্টাচারে,
সবারে সন্তোষ দানে।
লজ্জাবিভূষিতা, সর্ব্বগুণান্বিতা,
সরলা সত্যবাদিনী।
সাধ্বী পতিব্রতা, সদা ধর্ম্মে রতা,
সুশীলা প্রিয়ভাষিণী।
কর্ম্মেতে নিপুণা, শান্ত উচ্চমনা,
রোগেতে শান্তিদায়িনী।
ক্ষমা দয়া আর ঢালে স্নেহধার,
সমান ভক্তিশালিনী।
হৃদয় তাহার, সুধার আধার,
প্রীতি মমতার স্থান।
ছোট বড় জনে, ভেদ নাহি গণে,
সবারে দেখে সমান।
অনাথ দেখিলে, লয় কোলে তুলে,
আতুরে আশ্বাস দানে।
বিগলিত চিত, সাধে পরহিত,
সান্ত্বনা শোকার্ত্ত প্রাণে।
কি কাজ রতনে, কি কাজ ভূষণে,
কি কাজ রূপেতে তার,
গুণের ভূষণ, পরে যেই জন,
গৌরব রতন হার।

শ্রীমতী উষাপ্রমোদিনী বসু।

---

৩১ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্তৃক ৩৯নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 624. August, 1915.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬২৪ সংখ্যা। { শ্রাবণ, ১৩২২। আগষ্ট, ১৯১৫। } ১০ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

আমাদের কথা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রফুল্লকুমার

(১)

সরলার বিবাহের সময় বাড়ী আসিতে পারি নাই, অথবা ইচ্ছা করিয়াই আসি নাই। কলির ছেলেরা যেমন "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ" ভুলিতেছে, কলির পিতাঠাকুরমহাশয়েরাও বুঝি তেমনি "প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ" ভুলিয়া তাহার প্রতিশোধ লইতেছেন। নহিলে আজ আমার সোণার সরলার এই দশা। তোমরা বলিবে তাহার "কপাল"। ড্যাম্ তোমাদের কথা! আমি হিন্দু হইয়াও "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র নচ বিদ্যা নচ পৌরুষম্" এ কথার পদাঘাত করি। আমি ছোট বেলা হইতে শিখিয়াছি "দৈবেন দেয়ম্ ইতি কাপুরুষা বদন্তি।" বড় হইয়া হিন্দুদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্‌-গীতায়, গীতার প্রধান নায়ক শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখে শুনিয়াছি :—

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈ
র্গুণৈঃ॥

আমার তরুণ বুদ্ধিতে এই কথার মর্ম্ম যতদূর বুঝিয়াছি তাহা "পুরুষকার", passiveness নহে। ভাগ্য যাহা করিবার থাকে করুক, আমার সে দিকে দৃক্‌পাত করিবার আবশ্যক নাই,—ভাগ্যের দোহাই দিয়া হাত পা কোলে করিয়া বসিয়া থাকিবার আমার অধিকার নাই। গীতোক্ত ধর্ম্মোপদেশের এক অংশ শিক্ষা করিবার জন্য এই কর্ম্মবীর পাশ্চাত্য

জাতিকে আজি সম্মুখে পাইয়াছি। আমাদের ধর্ম্ম পুঁথিতে আছে কাজে নাই, তাহাদের ধর্ম্ম কাজে আছে পুঁথিতে নাই, তাই তাহারা বড়।

জিজ্ঞাসা করিবে "তুমি কি রকম হিন্দু?"—এই প্রাচ্য আদর্শ ও পাশ্চাত্য উদাহরণের সমবায়ে যে হিন্দু সৃষ্ট হইবে, যে হিন্দু প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সমন্বয় করিবে, যে হিন্দু "এদিক্ ওদিক্ দু দিক্ রেখে দুধের বাটী" খাইবে, যে হিন্দু সংসার ও সন্ন্যাসের দুখানি তরবারি দুই হাতে ঘুরাইবে, যে হিন্দু ভারতের দর্শন ও পাশ্চাত্যের শিল্পবিজ্ঞান একত্র করিয়া সোণার সংসার গড়িবে, যে হিন্দু বর্ত্তমান অধঃপতিত হিন্দু সমাজের আবর্জ্জনায় ঝাড়ু দিয়া, তাহার স্থানে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের সার উদ্দেশ্যের উপর সমাজের ভিত্তি স্থাপন করিবে,—সেই হিন্দু আসিতেছে! এই আশার অরুণালোক যে সকল বঙ্গীয় যুবকের মানস-চক্ষে পতিত হইয়াছে, এ অধম তাহাদেরই অন্যতম। যে হিন্দুকে দেখিয়া জগৎ ধর্ম্ম শিক্ষা করিবে, যে হিন্দু প্রাচীন আর্য্য জাতির জ্ঞানগরিমার লুপ্ত আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করিবে, আর যে হিন্দু স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি, মাতৃভূমি, আর্য্যভূমি, ভারতবর্ষকে আবার ঐশ্বর্য্যশালিনী করিবে; সেই হিন্দু আসিতেছে,—এই দুরাশা (?) যে সকল যুবক হৃদয়ে পোষণ করে, এ অধম তাহাদেরই একজন।

(২)

থাক্ সে কথা; এখন, যাহা বলিতেছিলাম, বাবার কথা, সরলার বিবাহের কথা, সরলার অকাল বৈধব্যের কথা,—আমার মর্ম্মজ্বালার কথা, ক্ষোভের কথা, দুঃখের কথা।

বাবা দরিদ্র স্বীকার করি, এবং ইহাও স্বীকার করি যে, "দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী,"—দরিদ্র হইলে মানুষের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়, কিন্তু চক্ষে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইলেও কি বুঝিতে নাই। আমিতো আর ছেলে মানুষ নহি; এখন আমার সহিত পরামর্শ করিয়া, আমার মতামত একটু শুনিয়া, একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া আমার যুক্তিগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিলে মন্দ ছিল কি? তাহাতো হইবার যো নাই; আমি ছেলে মানুষ, আমি নির্ব্বোধ, আমি সমাজের এবং কৌলীন্য-ধর্ম্মের কি বুঝি? আমি ইংরাজী পড়িয়া গোল্লায় গিয়াছি, তার উপর মড়া কাটিয়া কাটিয়া আমি আরও ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোপ করিতেছি, বাস্!

গত বৈশাখ মাসে সরলার বিবাহ হইয়াছে, বাবার হাতে পয়সা থাকিলে আরও দুই তিন বৎসর পূর্ব্বেই হইয়া যাইত। তাহাতে আর কিছু লাভ হৌক আর না হৌক, গৌরী দানের ফললাভ হইত, কিন্তু তাহা হইয়া উঠে নাই।

গত বৎসর আমি স্বয়ং আমার একটী বন্ধুর সহিত তাহার বিবাহ স্থির করিয়াছিলাম। আমার বন্ধু সুন্দর, সবল,

সচ্চরিত্র এবং বুদ্ধিমান্, আমার সঙ্গেই পড়িতেন। তাঁহার পিতার অবস্থা ভাল, এজন্য বিনা অর্থে আমার ভগ্নীর পাণি-গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। বাবা তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন এবং সুখ্যাতি করিতেও বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু আপত্তি উঠিল, তাঁহারা উত্তর-রাড়ী কায়স্থ—অতএব অস্পৃশ্য। কি সর্ব্বনাশ! তাঁহার পিতা শিক্ষিত, এজন্য আমাদের সহিত অর্থাৎ দক্ষিণ-রাড়ীর সহিত ক্রিয়া, করিলে চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হইবে মনে করিতেন না, এজন্য রাজি হইয়াছিলেন, এবং আমার ভগ্নীর মত সুন্দরী এবং শিক্ষিতা সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না বলিয়া, এ প্রস্তাবে বিশেষ আগ্রহও প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু আমি কিছুতেই বাবার মত করাইতে পারিলাম না, দত্ত মহাশয় এবং মেজদিদিও বুঝাইতে ত্রুটি করেন নাই।

হয়ত বাবাকে বা রাজি করিতে পারি-তাম, কিন্তু তর্করত্ন মহাশয়ের মধ্যস্থতায় সব মাটি হইল। তিনি বাবাকে বুঝাইয়া দিলেন যে,—এখনকার ছোঁড়াগুলা সমাজটাকে নষ্ট করিবে, তাহাদের মাথা গরম, তাহাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম-জ্ঞান নাই, তাহারা খৃষ্টান, ব্রহ্মজ্ঞানী, বেল্লিক ইত্যাদি ইত্যাদি। বাবা বলিলেন "ঠিক কথা।" তর্করত্ন মহাশয় আমার উপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন, কারণ যখন তাঁহার চতুর্থ পক্ষের বিবাহ হয়, তখন অপরাধের মধ্যে আমি বলিয়াছিলাম "তর্ক রত্ন ঠাকুরদাদা! পর পর তিনটি ঠান্‌দিদি যখন আপনার ঘরে আসিয়া বন্ধ্যা প্রমাণ হইলেন, তখন নূতন ঠান্‌দিদি যে উর্ব্বরা হইবেন, তাহা কেমন করিয়া বুঝিলেন? শেষ কাল, এখন ও সব ছাড়িয়া ঈশ্বরোপা-সনায় মন দিন,"—আর যাবে কোথায়? আমি যদি উকুন হইতাম, তবে বুঝি তিনি নখের উপর রাখিয়া নখ দিয়া আমাকে টিপিয়া মারিতেন। এজন্য বাবার কাছে বিস্তর বকুনি খাইয়াছিলাম।

তার পর দেখিয়া শুনিয়া আমরা হা'ল ছাড়িয়া দিলাম, কি করিব?

(৩)

মেজ দিদি ও দত্ত মহাশয় ইচ্ছা করিয়া-ছিলেন, অর্থ সাহায্য করিয়া সরলার ভাল যায়গায় বিবাহ দেন। কিন্তু বাবার একটি মহৎ গুণ ছিল,—উত্তরাধি-কারিত্বে আমিও তাঁহার সেই গুণের একটু অংশ বোধ হয় পাইয়াছি,—তিনি বিনিময় ব্যতীত কাহারও কোনও উপকার লইতে বড় রাজি ছিলেন না। বাবার সংসারে চির-দারিদ্র্য, মেজদিদি অতুল ধন-সম্পত্তির অধিকারিণী, এবং দত্ত মহাশয়ও সর্ব্বদা বাবাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, কিন্তু বাবা কোনও দিন তাঁহাদের এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। অধিকন্তু তিনি বলিতেন "বাবা, তুমি গরিবের কন্যা বিনা দক্ষিণায় গ্রহণ করিয়াছ, তোমার ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না, তোমরা সুখ স্বচ্ছন্দে থাক, তাই দেখিয়াই আমার সুখ। আমার মঙ্গলের ঈশ্বর এক রকম করিয়া অবশ্যই করিবেন।" সরলা

সর্ব্বদা মেজদিদির কাছে থাকিত, প্রায় সেইখানেই থাইত, মেজদিদি প্রায়ই তাকে এটা ওটা কিনিয়া দিতেন, তাহাও যেন বাবা পছন্দ করিতেন না।

আমি যখন এখান হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্চদশ টাকা বৃত্তি পাইলাম এবং কলিকাতায় পড়িতে চলিলাম, দত্ত মহাশয় ও মেজদিদি বার বার করিয়া বলিয়াছিলেন "তোর পোনেরো টাকায় কলিকাতায় থাকা কষ্ট হইবে, যখন যাহা আবশ্যক হবে লিখিস্ টাকা পাঠাবো—লজ্জা করিস্‌নে ভাই!" পাছে তাঁহারা প্রাণে ব্যথা পান, এজন্য আমি বলিয়াছিলাম "লিখিব, কিন্তু না লিখিলেও যদি টাকা পাঠাও তবে তাহা ফিরাইয়া দিব"। বলা বাহুল্য, অতি কষ্টে দিন কাটাইয়াছি, তথাপি চারি বৎসরের মধ্যে একটী পয়সাও গ্রহণ করি নাই। তবে বাড়ী আসিলে বা পূজার সময় পোষাক পরিচ্ছদ যাহা কিছু তাঁহারা আহ্লাদ করিয়া প্রস্তুত করাইয়া দিতেন তাহা ফিরাইয়া দিতে পারি নাই, কিন্তু মনে মনে মাথা কাটা যাইত।

এফ্, এ, পরীক্ষায়ও বৃত্তি পাইয়াছিলাম। পড়িবার কালে তাহাতেই চলিয়া ছিল, কিন্তু বি, এ পাস করিবার পর যখন আমার মেডিকেল্ কলেজে পড়িবার কথা হইল, তখন আমার নিজের কোনও আয় ছিল না। ছেলে পড়াইয়া মেডিকেল কলেজে পড়া তেমন সুবিধা নহে। এবার মেজদিদি বাবাকে ধরিয়া পড়িলেন, আমার পড়াইবার ভার সব লইবেন, দত্ত মহাশয়তো আমায় বিলাতে পাঠাইতেই প্রস্তুত, কিন্তু এক পুত্র—পিণ্ড তো চাই, আমি তাহা উড়াইয়া দিলাম। বাবা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, আমিও খবরের কাগজে wanted (কর্ম্মখালি) দেখিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু ১৯ বৎসর বয়স শুনিয়া আমার কোনও দরখাস্তই প্রায় মঞ্জুর হইল না—অবশ্য হেড্‌মাষ্টারী করিয়া এম্ এ দিবার জন্যই এই সকল দরখাস্ত করিয়াছিলাম। কেরাণী গিরীতে প্রবৃত্তি যায় নাই।

এদিকে দক্ষিণ পাড়া হইতে এক বিবাহের সম্বন্ধ আসিল। তখন জ্যৈষ্ঠ মাস, মেজদিদি লুকাইয়া আমার ভাবী পাত্রীকে তাঁর গাড়ী করিয়া আপনার বাড়ীতে আনিলেন—মা ও বাবাকে ভাল করিয়া দেখাইবেন এবং আমাদের দুটীকে বিবাহের আগেই একবার 'শুভদৃষ্টি' করাইয়া রাখিবেন। আমি অবশ্য এ সকল কথা আগে কিছুই টের পাই নাই। দত্ত মহাশয় হঠাৎ ন্যাকা সাজিয়া আমায় ডাকিয়া লইয়া গেলেন, বলিলেন "বাগান থেকে কলমের আম এসেছে, খাবি আয়।" দত্ত মহাশয় কিন্তু বাড়ীর মধ্যে না গিয়া, সরাসর খিড়কির বাগানের গেট খুলিয়া আমায় লইয়া চলিলেন। আমি বলিলাম "তুমি কি আমায় গাছে তুলিয়া দিয়া আম খাওয়াইবে নাকি?" তিনি বলিলেন "চল্‌তো!" রসাল লোভে লোল রসনায় আমি অগ্রসর হইলাম।

তিনি ক্রমে আমার হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া তাঁর মাধবী-কুঞ্জের মধ্যে ঢুকিলেন, আমায় বলিলেন "শান্তমিদমাশ্রমপদম্—কেমন রে?" আমি বলিলাম "তার পর?" "তার পর তোর বোধ হয় এতক্ষণ "স্ফুরতি চ বাহু"। আমি বলিলাম "অপরাধ"? "তোর জন্ম আজ যে শকুন্তলা যোগাড় করিয়া ফেলিয়াছি!" আমি বলিলাম "কোন্ গাছে?" "গাছে কিরে? ঐ একবার তাকিয়ে দেখ্ না—তখন বলিস্ সত্যসত্যই 'পরাজিতা খলু উদ্যান-লতা বনলতাভিঃ' কিনা?" আমি বলিলাম "তুমি খুব অং বং সং শিখেছ তা জানি, এখন আম পেরে তো দাও। "আরে আম তো খাবি, একবার দেখ্ দেখি, আজ মালতীকে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে—তার সঙ্গে তোর বোন কেমন বেড়াচ্ছে, একবার তাকিয়ে দেখ্", এই বলিয়া আমায় আঙ্গুল দিয়া দেখাইলেন। তাঁর অঙ্গুলি নির্দ্দেশানুসারে চাহিয়া দেখি মেজদিদি আর মালতী দুজনে অদূরে পাঁচীলের ধারে বেলফুলের সারে জল দিতেছেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে দত্ত মহাশয় মেজদিদিকে লক্ষ্য করিয়া চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন "ওগো প্রিয়ম্বদে!" এতক্ষণে দত্ত মহাশয়ের নষ্টামী বুঝিতে পারিলাম, সব ষড়যন্ত্র বুঝিলাম। মেজদিদি যেমন আমাদের দিকে চাহিয়াছেন, আমার লজ্জায় প্রাণ বাহির হইয়া গেল, দত্ত মহাশয়কে ধাক্কা দিয়া একখানা বেঞ্চের উপর ফেলিয়া দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পাঁচিল উল্লম্ফন করিয়া পলাইয়া এক দৌড়ে বাড়ী আসিলাম। মেজদিদি কি মনে করিবেন! লুকাইয়া আমি মালতীকে দেখিতে আসিয়াছিলাম! আর ওখানে যাবো না।

তোমরা বলিবে "কেমন দেখিলে?" মালতীকে আজ নূতন দেখি নাই। তাদের পাড়ায় আমাদের স্কুল, তাদেরই বাড়ীর পার্শ্বে আমাদের খেলিবার ময়দান এবং জিম্‌নাষ্টিকের আখ্‌ড়া। খেলিতে খেলিতে জল পিপাসা পাইলে হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাদেরই বাড়ী যাইতাম, সে হাতে করিয়া অনেক জল দিয়াছে। তাহার দিদি মা তামাসা করিয়া বলিতেন "পেরফুল্লোর সঙ্গে মুলুতীর বিয়ে দেবো—দুটীতে বেশ মানাবে।" আমরা দুজনে চোখ-চোখি করিয়া হাসিতাম, আমি মুখ-ফোঁড় ছিলাম, বলিতাম "তুমি আমার বৌ", মালতী "যাঃ" বলিয়া হসিয়া পলাইত। আবার ঘরের ভিতর গিয়া সে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইত, আমি মুখ ভেংচাইতাম, সে আবার আমায় ছোট রাঙা হাতের কীল দেখাইয়া পলাইত। যখন কলিকাতায় বি, এ পড়ি, তখনও পূজার ছুটীতে, গ্রীষ্মের ছুটীতে বাড়ী থাকিতাম, মালতীদের পাড়ায় খেলিতে গিয়া তাদের বাড়ী বসিতাম, আর তার সঙ্গে অমনি করিতাম। মালতী দূর সম্পর্কে মেজদিদির ননন্দা, মেজদিদি বলিয়াছিলেন নিশ্চয়ই এদের দুটীতে বিবাহ দিব। কাজেই মনে মনে মালতীর সঙ্গে এক প্রকার—হইয়াই গিয়াছিল। অতএব মালতীকে এই নূতন

দেখিলাম না। কিন্তু যদি নূতনও আর দেখিতাম, তথাপি একবার মাত্র দেখিয়াই বলিতে পারিতাম "সুন্দরী"! আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই জানি যে, সৌন্দর্য্য চিনিতে খুঁটি নাটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয় না। সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণের বিষয় নহে, সংশ্লেষণের বিষয়। কেমন নাক, কেমন চোখ, কেমন দাঁত, কেমন হাসি, কেমন তান, এমন করিয়া সৌন্দর্য্য দেখিতে যাওয়া অন্ধতার পরিচায়ক। যাহার চক্ষু আছে তাহার সম্মুখে একবার মাত্র পড়িলে সে তৎক্ষণাৎ সুন্দর অসুন্দর চিনিয়া লইতে পারে—তাহাকে আর অঙ্ক কসিয়া দেখিতে হয় না। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যাহারা মন প্রাণ নিক্ষেপ করে, তাদেরও বুঝি এই রীতি! তাই বুঝি জগতের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াছেন—"Who ever loved, that loved not at the first sight?"

তোমরা জিজ্ঞাসা করিবে "তুমি কি তবে তাকে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছিলে?" আমি তাহা স্বীকার করি না। জীব-হৃদয়ের—বিশেষতঃ মনুষ্য-হৃদয়ের ঐ বৃত্তিটীকে আমি হৃদয়ের দুর্ব্বলতা মনে করিয়া তাহাকে আদৌ প্রশ্রয় দেওয়া শ্রেয়ঃ মনে করি নাই। ইচ্ছা ছিল মনকে কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করাইব। শুনিয়াছি ভাল বাসিয়া আজিও নাকি কেহ সুখী হয় নাই। তবে তো এ যাত্রা বিলক্ষণ জিত দেখিতেছি।

(৪)

তার পর শুনিলাম বাবা ও মা দশমুখে মালতীর সুখ্যাতি করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বাস্তবিক আমার ভগ্নীদের পার্শ্বে দাঁড়াইবার উপযুক্ত—রূপে ও গুণে—গ্রামে অন্য কোনো মেয়ে ছিল না—কেবল মালতীই ছিল। মার এজন্য ভারি টান ছিল তাকে পুত্রবধূ করেন। কিন্তু—

মেজদিদির ইচ্ছা সেই দ্বাদশবর্ষীয়া নারী-রত্নকে আমার হস্তে, অথবা আমাকে সেই নারী-রত্নের হস্তে, সমর্পণ করিয়া রাখিয়া, আমার নিজের ব্যয়ে ডাক্তারী পড়ান। অথবা বাবা যদি তাতে রাজি নাও হন, তথাপি অন্য কোনও স্থানে চাকরীর জোগাড় করিয়া দেন, অথবা কলিকাতায় আমি ছেলে পড়াইয়া এম্‌ এ অথবা আইন পড়ি। দত্ত মহাশয়ের অনেক বড় লোক বন্ধু বান্ধব আছেন, এসব জোগাড় তিনিই করিয়া দিবেন।

মেজদিদির খরচে ডাক্তারী পড়ানতে বাবা কিছুতেই সম্মত হইলেন না—বলা বাহুল্য আমিও নই। শেষে বাবা প্রস্তাব করিলেন, যদি মালতীর পিতা আমাকে ডাক্তারী পড়াইতে পারেন, তবে বিবাহ দিবেন। তিনি এখন না হয় ধার কর্জ্জ করিয়া কিছু দিতে পারেন, কিন্তু পড়ার খরচ তাঁর সাধ্যাতীত। দত্ত মহাশয় অন্যত্র পাত্রী সন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন, যাহাতে পড়ার খরচও পাওয়া যায়, মেয়েও ভদ্রলোকের মত হয়;—কেননা বাবা কন্যা গ্রহণের বিনিময়ে পড়ার খরচ লইতে রাজি আছেন। বাবার ইচ্ছা আমি খুব বড় মানুষ হই—তার জন্য

ডাক্তারীই নাকি তাঁর মতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়।

এইবার হঠাৎ তাহা মিলিল। তর্করত্ন মহাশয় আসরে অবতীর্ণ হইলেন। যাহাতে আমার ভবিষ্যতে "ভাল" হয়, তাহার উপায় না করিয়া তিনি কিছুতেই নিরস্ত হইবেন না।—তিনি আমাকে বড় ভাল বাসেন কিনা! বাবাও তাঁর খুব অনুগত, যেহেতু তিনি জবরদস্ত পণ্ডিত, তর্কে তাঁর ভয়ানক তেজ, কত সব সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করিয়া অসাধ্য সাধন করিয়া ফেলিয়াছেন—খুব জাঁক। রামতনু বসুর পিতৃশ্রাদ্ধের দিনে যখন ভট্টপল্লীর বিখ্যাত রণজয়ী পণ্ডিতদিগের সঙ্গে তাঁহার "তৈলাধার ভাণ্ড অথবা ভাণ্ডাধার তৈল" এই গুরুগম্ভীর দার্শনিক মীমাংসা লইয়া গজকচ্ছপী তর্ক হয়, তখন তাঁহার সাতবার কাছা খুলিয়া গিয়াছিল এবং তিন বার নস্যের ডিবা উল্টাইয়া গালিচার উপর নস্য পড়িয়া গিয়া, নস্যাধার ডিবা প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি বীরদর্পে প্রমাণ করিয়াছিলেন—তৈলই ভাণ্ডের আধার, অন্ততঃ তৈল যে ভাণ্ডের আধার নহে, ইহা কেহ ন্যায় শাস্ত্রের সাহায্যে প্রতিপন্ন করিতে পারেন না। তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রে প্রগাঢ় দখলের নমুনা আমাকে একদিন দিয়াছিলেন। আমি তাঁহার শেষ বিবাহ উপলক্ষ্য করিয়া যখন বলিয়াছিলাম "তিন কাল গিয়াছে, এখন ছেলে মানুষকে বিবাহ করিলে লোকেই বা কি মনে করে, আর বিবাহিতা তরুণীই বা কি মনে করবে?" তাহাতে তিনি আমায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, পঞ্জিকা যেমন কখনো পুরাতন হয় না, তেমনি পুরুষমানুষ কখনও পুরাতন হয় না। অধিকন্তু, মানুষের আহার্য্য চতুর্ব্বিধ—চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য এবং পেয়—তার মধ্যে আজিও যখন তাঁহার চোষ্য, লেহ্য এবং পেয় এই ত্রিবিধ খাদ্যে অধিকার আছে, তখন তাঁহার বয়সেরও তিন কাল আছে, এক কাল মাত্র গিয়াছে—ইহাই ন্যায়ানুমোদিত সিদ্ধান্ত। বলিহারি! আমি যখন তাঁহার এই অপূর্ব্ব লজিকের কথা মেজদিদি ও দত্ত মহাশয়কে শুনাইলাম, তখন দত্ত মহাশয় বলিলেন "হাঁ, genius বটে! নহিলে আর চার বিঘা ভূমিতে এক গাছা খড়ও জন্মিল না! ঝাঁজ কত!" মেজদিদি মুখে কাপড় দিয়া উঠিয়া গেলেন। দত্ত মহাশয় বড় বেয়াদব। যাহোক, এহেন পুরুষ-প্রধান, ধর্ম্ম এবং সমাজ তত্ত্বজ্ঞ তর্করত্ন মহাশয় যাহা বলিবেন বাবার তাহা শিরোধার্য্য।

কলিকাতার একজন ধনী ডাক্তার তাঁহার শিষ্য, তিনি কুলীন, তাঁহার কন্যা ঘরে আসিলে আমাদের বংশ-গৌরবে হৈ হৈ পড়িয়া যাইবে, এবং তিনি যোদ সুপারিশ্ করিলে তাঁহার শিষ্য মহাশয় এ অধম বংশে কন্যা দান করিবেন, তাহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। আর কন্যাটীও দেখিতে "মন্দ নহে"—মেয়ে মানুষ কুশ্রী হইতেই পারে না, নামই যার fair sex, যেমন বাংলাতে "কোমলাঙ্গী,"

"সুন্দরী" প্রভৃতি বলিলে, মেয়ে মানুষই বুঝিতে হইবে। তার পর গুণের তো কথাই নাই, এখনকার ছোঁড়ারা মেয়ে মানুষের লেখা পড়া পছন্দ করে, তা সে মেয়ের নাকি তাও পর্য্যন্ত জানা আছে—এমন কি যুক্ত অক্ষর পর্য্যন্ত সে নিজে হাতে লিখিতে পারে। অধিক কথা কি, তর্করত্ন মহাশয় স্বয়ং একবার দেখিয়া আসিয়াছেন যে, সে মেয়ে, এত বড় লোকের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও, আপন হাতে ভাত তুলিয়া খাইতে পারে। আরও প্রশংসার কথা এই যে, পান পর্য্যন্ত সে শীঘ্রই সাজিতে শিখিবে এমন সম্ভাবনাও নাকি তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন। বয়স ত্রয়োদশ মাত্র—এরই মধ্যে এমন তৈয়ার হইয়াছে। বাবা এ সকল কথায় কর্ণপাত যত করুন আর নাই করুন, পড়ার খরচ মিলিবে এ বিষয়ে নিশ্চিত হইলেন এবং আমি বড় মানুষ হইব তদ্বিষয়েও দৃঢ়-নিশ্চয় হইলেন।—মালতীর সঙ্গে বিবাহ দিলে ভবিষ্যতে আমার বড় লোক হওয়া অনিশ্চিত। ঝট্ পট্ সমস্ত স্থির হইয়া গেল, বিবাহও হইয়া গেল। আমিও good boy অর্থাৎ ভাল ছেলেটীর মত বিবাহ করিয়া ফেলিলাম। মেজদিদি ও দত্ত মহাশয় ক্রোধে গর্ গর্ করিতে লাগিলেন, আমি চুপ্ চাপ্। বাবার ইচ্ছা আমি বড় মানুষ হই,—তথাস্তু। সেই অবধি "বসা কন্তা বিবাহিতা" মহাশয়ই আমায় ডাক্তারী পড়াইয়াছেন, এম্-বি পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিয়াছি, দেখি কি হয়।

(৫)

সে সব কথা যাক, এখন একি সর্ব্বনাশ হইল!—আমার সরলার এখন কি হবে? এ কথা ভাবিয়া যে আমি অন্ধকার দেখিতেছি। আমার জ্ঞান, বুদ্ধি, শিক্ষা, দীক্ষা সবই যে আমায় ত্যাগ করিতেছে।

সরলা বড় চঞ্চলা, বড় মুখরা, বড় প্রখরা ছিল। আহা পর-দুঃখ-কাতর, শাস্ত্রজ্ঞ, দেবচরিত্র, বিদ্যারত্ন মহাশয় আজ দুই বৎসর হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তাঁহার সেই সূর্য্যদেবের মত তেজঃপুঞ্জময় অথচ শশধর-সদৃশ কমনীয় মুখকান্তি মনে হইলে ভক্তিভরে আজিও চক্ষে অশ্রু গড়াইয়া আসে। দয়ার সাগর, গুণের সাগর, পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার যেন হরি-হর আত্মা ছিল। মনে হয় এই সকল শ্রেণীর মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন বলিয়াই, আজিও ভারতের আকাশে চন্দ্র সূর্য্য উঠে, হিন্দুসমাজ আবার সুস্থ হইবে বলিয়া আশা হয়, আমরা আজিও মরি নাই বলিয়া বোধ হয়। বিদ্যারত্ন মহাশয় বাবাকে বলিতেন "ছেলে মেয়েগুলাকে ছোট বেলায় চঞ্চল দুরন্ত দেখিলে আমার বড় আনন্দ হয়। এ সকল তাহাদের ভবিষ্যতের বুদ্ধিপ্রাখর্য্য এবং কার্য্যতৎপরতার পূর্ব্বাভাস, তোমার ছোট মেয়েটিকে আমি বেশ দেখি—যেন ঠিক শারদ সন্ধ্যার চঞ্চল জোনাকি পোকাটি, তোমার সরোজিনীর চেয়েও এর বুদ্ধিশুদ্ধি বেশী হবে। এ সকল মেয়ে রত্ন-গর্ভা, ভাল দেখে বিয়ে দিও। আহা, বেঁচে

থাক্, বেঁচে থাক্।" স্বর্গীয় বিদ্যারত্ন মহাশয়! আপনার পবিত্র মুখের আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হইবার নহে,—সরলা বাঁচিয়া আছে। আপনি পরম জ্ঞানী, আপনি প্রকৃতির গতির উপর অভিমতের ভিত্তি গড়িয়াছিলেন। কিন্তু আমরা যে "খোদার উপর খোদ্‌কারি" করিতে শিখিয়াছি, আপনার সরল বুদ্ধিতে তাহা আপনি কেমন করিয়া ধরিবেন?

বিদ্যারত্ন মহাশয় সত্যই বলিতেন, সরলার মত প্রখরবুদ্ধি আমি দেখি নাই। তেরো বৎসর বয়সের মধ্যে সে দত্ত মহাশয় ও মেজদিদির কাছে যতটা শিক্ষালাভ করিয়াছে, আমি বুঝি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও ততটা পারি নাই, আমি চৌদ্দ বৎসরে এন্‌ট্রান্স পাশ করিয়াছিলাম। এ আশ্চর্য্য মেয়ে। এ ছাড়া মেজদিদির মস্তিষ্কে এমন কোনও প্রকার শিল্প-বিদ্যা নাই যাহা সে এই বয়সে আয়ত্ত করে নাই। মেজদিদি বলিতেন "আর তোকে কি শিখাইব? বিয়ে হ'লে শ্বশুরবাড়ী গিয়া ননদ-জায়েদের কাছে আরও শিখিস্।" তাতো সবই হইল, আর হইলেও তাঁহার শিখার শিক্ষার উপর কেহ টেক্কা দিতে পারিত বলিয়া তো বোধ হয় না। আমার মেজদিদির মত শিক্ষিতা নারী-রত্ন আমাদের বর্ত্তমান সমাজ কয়জন বাহির করিতে পারে?—বড় বেশী নয়। কিন্তু সবই তো হইল! সরলা পাতা কুড়াইয়াই মরিল—আগুন পোহান আর তার হইল না,—বুঝি পাতা কুড়াইতেই তার জীবন যাইবে! কিন্তু—কিন্তু—কেন যাইবে? যাইতে দিব না—সে নিরপরাধিনী—রাক্ষস সমাজ আমার সরলাকে নিরপরাধে মারিবে? তা—কখনই না—এর জন্য আমার যাহা করিতে হয় করিব, বাবার অবাধ্য হইতে হয়, তাহাও হইব—বাবার পায়ে ধরিয়া কাঁদিব—আমি সরলার নিশ্চয়ই বিবাহ দিব—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

ঠিক কথা, আর সহ্য হয় না—অন্যায়—এই মেজদির কাছে চলিলাম।

(ক্রমশঃ)

মার্কিন ও বঙ্গমহিলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)ঃ

স্বাস্থ্য।

আমেরিকাতে যে সমস্ত মহিলা উচ্চশিক্ষা পাইয়া থাকেন এবং যাঁহারা পুরুষোপযোগী কার্য্যে নিযুক্তা, তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভাল নহে; কেহ বা অত্যন্ত স্থূলকায়, কেহ বা অত্যন্ত কৃশাঙ্গী এবং তাঁহাদের

শরীরের মধ্যেও নানাবিধ ব্যাধি আছে। আবার যাঁহারা পুরুষদের মত বেশী বক্তৃতাদি করেন, পুরুষদের সঙ্গে পাঠে প্রতিদ্বন্দ্বী হন, তাঁহাদেরও শরীরে নানাপ্রকার অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশিত হয়। আমাদের দেশের কলেজ-ক্লাসের মেয়েদের স্বাস্থ্য আমেরিকার ছাত্রীদের অপেক্ষাও মন্দ, তাহার কারণ এ ভিন্ন আর কিছু নহে —(১) তাহাদিগকে অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়। (২) হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম না করিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। (৩) প্রচুর পরিমাণে ঘি, মশলা না দেওয়া বোর্ডিংএর রান্না ভাত, তরকারী খাইয়া তাহাদের মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। (৪) "বাস্" আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে শুনিবামাত্র মেয়েরা নাকে মুখে তাড়াতাড়ি ভাত গুঁজিয়া স্কুল কলেজে যাওয়াতে অনেকে appendicitis রোগে ভুগিতেছেন। (৫) তাহাদিগকে যেরূপ মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, তদনুরূপ ব্যায়ামের সুব্যবস্থা নাই। আমেরিকার মহিলাদের dormitoryর যিনি তত্ত্বাবধায়ক, তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য এই যে, প্রত্যেক মেয়ে নিয়মমত কোনরূপ ব্যায়াম করিতেছে কিনা তাহা দেখা। বোধ হয় আমাদের মেয়েদের স্কুলের ও কলেজের হষ্টেলের সুপারিন্টেন্‌ডেণ্ট সে দিকে দৃষ্টি রাখেন না। আমেরিকার মহিলারা ঘোড়ায় চড়েন, বাইসাইকেলে চড়েন, বরফের উপরে স্কেট্‌ করেন, টেনিস্ খেলেন, পদব্রজেও বেড়ান। তাঁহারা আমাদের মেয়েদের মত অবরুদ্ধ গাড়ীতে এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাতায়াত করেন না, তাঁহাদের স্বাস্থ্য উন্নতিরও নানাবিধ সুবিধা আছে। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন কোন একটী মেয়ে ভর্ত্তি হইবার জন্য আসেন, তাঁহাকে Black কার্ডে নিম্নলিখিত প্রশ্ন সকলের উত্তর লিখিয়া ঐ কার্ডটি সঙ্গে লইয়া স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হইতে হয়। যদি কাহারও শরীরমধ্যে কোন ব্যাধি থাকে, তাহা হইলে স্বাস্থ্য অধ্যক্ষের উপদেশ মত সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা দেওয়া হয় :—

নং— নাম—

জন্ম তারিখ—

তোমার চেহারা তোমার পিতার মতন, না তোমার মাতার মতন, বা বংশের মধ্যে অন্য কাহার মতন ?

তোমার পিতা জীবিত ?—তাঁহার স্বাস্থ্য কিরূপ ?—

তিনি মৃত ?—কি অসুখে মারা যান ?—

তোমার মাতা জীবিত ?—তাঁহার স্বাস্থ্য কিরূপ ?—

তিনি মৃত ?—কি অসুখে মারা যান ?—

তোমার ক'টী ভাই ও বোন ?—কি কি ব্যারামে তাহাদের মৃত্যু হয় ?—

তুমি সহরের মেয়ে ? না পল্লিগ্রামের ?—

কি কি পীড়ায় তুমি শয্যাশায়ী হইয়াছিলে ?—তোমার ক্ষুধা হয় ?—তোমার কি অজীর্ণ রোগ আছে ?—তোমার কি কোষ্ঠবদ্ধ হয় ?—তুমি নাক দিয়া সহজে

নিঃশ্বাস ফেলিতে পার?—তোমার কি মাথা ধরে?—তোমার চক্ষুর বা কর্ণের কোন পীড়া আছে?—তুমি কখন মূর্চ্ছা গিয়াছিলে?—তুমি কি ভালরূপ নিদ্রা যাও?—কয় ঘণ্টা?—কয় ঘণ্টা তুমি প্রত্যহ উন্মুক্ত বাতাসে কাটাও?—তোমার শরীরের উপর কখন অস্ত্র প্রয়োগ করা হইয়াছিল?—

Menstrual period—কোন্ বয়সে তুমি প্রথম অসুস্থ বোধ কর?—

নিম্নলিখিত ব্যায়ামের মধ্যে যে গুলি তুমি করিয়াছ, সে গুলির তলায় দাগ দাও:—টেনিস্, গল্‌ফ্, বাইসাইক্লিং, ঘোড়ায় চড়া, দৌড়ান, লাফান, কুস্তিকরা, সাঁতার দেওয়া, দাঁড়টানা, স্কেটিং, বরফের উপর হকি খেলা, বেড়ান, শীকার করা, বাস্কেট বল।"

স্নান।

আমেরিকার অনেক বাড়ীতে স্নানের বন্দোবস্ত না থাকাতে অনেক মহিলা প্রত্যহ স্নান করিতে পারে না। কেহ কেহ মাসের মধ্যে দু, তিনবার মাত্র স্নান করিয়া থাকেন। আমরা প্রথম প্রথম ঐ সমস্ত মেয়েদের সহিত ক্লাসে বসিবার সময় তাহাদের শরীর হইতে কি রকম একটা দুর্গন্ধ পাইতাম। প্রত্যহ স্নান না করাতে এমন কি দেখিয়াছি যে, কেহ কেহ নানাপ্রকার চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হয়। তাঁহারা এমন সুন্দরী যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকাও উঁহাদের সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার জন্য চর্ম্মের মধ্যে বাসা করিয়া থাকে। যে সমস্ত বাড়ীতে স্নান করিবার বন্দোবস্ত নাই, সে সমস্ত বাড়ীর মহিলারা Public Bath House-এতে ২৫ সেণ্ট অর্থাৎ ৵০ আনা দিয়া একবার স্নান করিতে পারেন। তাহা সকলের অবস্থায় সম্ভবপর হয় না বলিয়া অনেকে নানারূপ অসুখে ভোগেন। যে সমস্ত বাড়ীতে স্নানের বন্দোবস্ত আছে, সেই বাড়ীর মহিলারা বলিয়া থাকেন যে, শীতপ্রধান দেশে সূর্য্যের মুখ কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়, সে জন্য চুল শুকাইবার অসুবিধা হয়, এই কারণ বশতঃ তাঁহারাও প্রত্যহ স্নান করেন না। আজকাল আমেরিকায় "electric hair dryer" ঘরে ঘরে হওয়াতে যখন তখন চুল শুকাইবার সুবিধা হইয়াছে। এক্ষণে মহিলারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নান করিতেছেন।

আমাদের দেশে মেয়েদের যেমন স্নান করিবার সুবিধা আছে, তেমন আর কোন দেশে নাই। আমাদের দেশের মেয়েরা রাস্তা ঘাটে যে ভাবে স্নান করেন, তাহা পাশ্চাত্য জাতিদের চক্ষে কেমন ঠেকে। মহিলাদের Bath room ভিন্ন অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে বিশেষতঃ পুরুষের সামনে স্নান করাটা তাঁহাদের দেশের সভ্যতার মধ্যে গণনীয় নহে।—

"BEAUTY PARLOUR"

আমেরিকার অধিকাংশ মেয়েরাই পর-চুল পরিয়া থাকেন। শীত-প্রধান দেশে যে প্রকার বরফ পড়ে তাহাতে মাথায় টুপি অথবা কোন রূপ বনেট্ থাকা প্রয়োজন।

আজ কাল আমেরিকার মেয়েদের যে রকম বড় বড় টুপির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণ পরচুলা না পরিলে টুপির ভার বহা একটু শক্ত হয়। আমেরিকার মহিলাদের মধ্যে মধ্যে নাপিতের বাড়ী যাইয়া পরচুলা কিনিয়া আনিতে হয়, চুল রং করাইতে হয়, চুল ছাঁটিতে হয়, পা'র ও হাতের নখ কাটিতে এবং পায়ের কড়া আরোগ্য করিতে হয়। ইহার feeর দরুণ কোন কোন সোসাইটীকে ২৫ ডলার অর্থাৎ ৭৫৲ টাকা একবারে দিতে হয়। নিউইয়র্কে Beauty Parlour নামে ঐ রকম বড় বড় নাপিতের দোকান আছে। সেখানে সর্ব্ব শ্রেণীর মহিলারা, কেহ বা সপ্তাহে একবার করিয়া, কেহ বা মাসের মধ্যে একবার করিয়া নিজের বেণী ঠিক করিবার জন্য ও গাল ও বক্ষ হইতে চর্ম্মরোগ ভাল করিবার জন্য যাইয়া থাকেন।

পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে অনেকে অবাক হইতেছেন যে, সামান্য চুল ছাঁটিতে ও চুল রং করিতে ৭৫৲ টাকা নাপিতকে দিতে হয়! আমি তবে ঐ Beauty Parlour কিরূপ তাহা একটু বলি। ওখানে দুই তিন জন পুরুষ নাপিত ও দুই তিন জন মেয়ে নাপিতানীও থাকে। 'Beauty Parlour' যখন নাম, তখন ওখানে মহিলা ভিন্ন পুরুষ চুল ছাটিবার জন্য ঢুকিতে পারেন না, তবুও কিন্তু পুরুষ নাপিত থাকে। সেখানে নাপিত ও নাপিতানীদিগকে নানাবিধ মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদপত্র গ্রহণ করিতে হয়। সেগুলি সমস্ত টেবিলের উপর সাজান থাকে। তাস ও "পুল্" খেলিবার সরঞ্জামও তথায় আছে। মহিলাদিগের অপেক্ষা করিবার জন্য ২০।২৫ খান চেয়ারও রাখা হয়। ঘরগুলি বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার দ্বারা সজ্জিত। মুখ ও চুল ধুইবার জন্য সেখানে গরম জল, সাবান প্রভৃতি পাওয়া যায়। ঘরের সমস্ত দেওয়ালগুলি বড় বড় আয়না দ্বারা আবৃত। যে নাপিতকে establishment স্বরূপ এতদূর সরঞ্জাম করিয়া রাখিতে হয়, তাঁহার পক্ষে ঐরূপ উচ্চ fee আদায় না করিলে তিনি কিরূপে ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারিবেন?

যখন একেবারে অনেক মহিলা প্রবেশ করেন এবং নাপিত ও নাপিতানীগণ ইতিপূর্ব্বে যদি পাঁচ ছয়টী মহিলার চুল কাটিবার জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকেন, তখন মহিলাদিগকে অগত্যা খবরের কাগজ পাঠে বা তাস খেলাতে বা বিলিয়ার্ড খেলাতে সেখানে সময় কাটাইতে হয়। নাপিত "Next" বলিয়া ডাক ছাড়িলেই তাঁহার পরে যিনি আসিয়াছেন, সেই মহিলাটী চুল ছাঁটিবার বা তাঁহার যে জন্য দরকার সেই জন্য প্রবেশ করেন। এখানে এই নিয়ম যে, যিনি যেমন প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি পর পর চুলছাঁটা প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া চলিয়া যাইবেন।

পোষাক।

"যাঁহাদের রূপ আছে তাঁহাদের বেশী

অলঙ্কারের দরকার নাই।" একজন আমেরিকার মহিলা গল্পচ্ছলে এই কথা আমাকে বলিয়াছিলেন। প্রকৃত তাই, সে দেশের মহিলাগণ আমাদের হিন্দু-রমণীদের মত অত অলঙ্কারপ্রিয় নহেন, তবে তাঁহাদের বেশ ভূষার খুব পারিপাট্য। যখন তাঁহারা কর্সেট্ আঁটিয়া, কোমরটী বোলতার ন্যায় সরু করিয়া, নাসিকা থাকিতে মুখ দিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে চলেন, লম্বা স্কার্ট পরিয়া খস্খস্ ও মস্মস্ শব্দে তদুপরি উচ্চ গোড়ালিযুক্ত জুতা পরিয়া হাঁটেন, এবং আরও যখন রং করা পরচুলার উপর ছাতার মত বড় টুপি পরেন, সে দৃশ্য দেখিয়া কোন বলবান্ পুরুষও nervous না হইয়া থাকিতে পারেন না। শুনিয়াছি আমাদের মধ্যে কোন কোন বিলাত-ফের্ত্তা নিজের গৃহলক্ষ্মীকে ঐরূপ পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করিতে শিক্ষা দিতেছেন। কলিকাতার হোয়াইট্‌ওয়ে লেড্‌লো এণ্ড কোম্পানীর দোকানের সম্মুখে চৌরঙ্গির পথ দিয়া যাইতে যাইতে তাহা বেশ দেখা যায়। আমরা ঐ সমস্ত বিংশ শতাব্দীর নূতন বাঙ্গালী বিবিদের অগ্র হইতে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, কর্সেট্ পরাতে শরীরের গঠন কখন স্বাভাবিক হয় না। নাসিকা থাকিতে গাল দিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে হয়, কর্সেট্ পরাতে পৃষ্ঠদেশ ও কোমরে চাপ পড়িয়া দাগের সৃষ্টি হয় ও তদ্দ্বারা চর্ম্মের শোভা নষ্ট হয়। মে মাসের আমেরিকার 'Physical Culture' নামক মাসিক পত্রে আছে :—"যদি তুমি বিবাহ করিতে চাও, কখন কর্সেট্ পরা মেয়ের পাণিগ্রহণ করিও না। নিশ্চয় জানিও তিনি কখন ভবিষ্যতে ভাল 'মা' হইতে পারিবেন না।" আজকাল বঙ্গমহিলাদিগের মধ্যে কেহ কেহ চাকচিক্য, জরীর কাজ করা পেটীকোট্ পরিয়া এবং তাহার উপর অতি পাতলা ফিন্‌ফিনে সাড়ী পরিয়া ভদ্রসমাজে বাহির হইতেছেন। এ সম্বন্ধে রেভারেণ্ড ডিকিন্‌সন্ তাঁহার নিউইয়র্ক বক্তৃতাতে বলিয়াছেন :—"ভদ্রবংশের মহিলাদের ঐরূপ পেটিকোট্ পরিধান করিয়া গির্জ্জায় আসাতে নিজেদের অতিশয় লজ্জা বোধ করা উচিত"। আমাদের দেশের মহিলারা যখন উচ্চ গোড়ালিযুক্ত ও টাইট্ জুতা পরিয়া হাঁটেন, তাঁহাদের দ্রুত চলিতে গেলে, হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়, এবং পরিশেষে "কড়ায়" সৃষ্টি হওয়ায় জুতা পায়ে দেওয়া কিছু দিনের জন্য একেবারে ছাড়িতে হয়। আমাদের এইরূপ সভ্যতার প্রয়োজন কি?

(ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যশরণ সিংহ।

মাতৃ-স্নেহ।

সন্ধ্যার পর জনপূর্ণ সরাইখানা কলরব-কোলাহলে গুলজার হইয়া উঠিয়াছে। এক দিকে দাবা-বড়ে, অন্য দিকে পাশা এবং অপর দিকটা বিষয়ী বুদ্ধিমান্‌দিগের মামলা-বাজীর উৎকট ছন্দে, উদ্দম স্বরে ধ্বনিত হইতেছিল। প্রকাণ্ড ঘরের একটী কোণে বসিয়া, আলোর কাছে হেঁট হইয়া, একজন তরুণ চিত্রকর আপন মনে তাহার সদ্যঃসম্পূর্ণ ছবিটীর বর্ণবিন্যাসগুলি গভীর মনোযোগের সহিত সংশোধন করিতেছিল। সমস্ত সরাইখানা ভরা—সমস্ত কলরব তাহার স্থির নিবিষ্ট চিত্তের পর্দায় ঠেকিয়া আহত হইয়া ফিরিতেছিল, চিত্রকর নিশ্চিন্ত উদাসীন।

পাশা-খেলোয়াড়গণের কোলাহল ঝাঁকিয়া উঠিতে লাগিল। অন্য দিকে একটী পয়সাওয়ালা পিতৃহীন যুবককে ঘেরিয়া মামলাবাজ আইনজ্ঞের দল কি করিয়া বিধবা মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ফাঁকী দিয়া নিরুদ্বেগে পৈতৃক সম্পত্তি সমস্ত আত্মসাৎ করিতে পারা যায়, তাহার পরামর্শ দিতে লাগিলেন।

একটা মিথ্যা মার পিটের মামলা সাজান হইতেছিল। বুদ্ধিমান্ মোক্তার সুদক্ষ কারিকরের মত ঘটনাটা নিপুণতার সহিত গড়িয়া তুলিতেছিলেন। পরামর্শ চুপি চুপি চলিতেছিল, সহসা তিনি জোর গলার শেষ কথা বলিয়া উঠিলেন "মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে ঠোঁট টা গেল ছেঁচে!"…

তুলি হাতে চিত্রশিল্পী চমকিয়া বলিল "কই?"—সে সবিস্ময়ে বক্তার মুখ পানে তাকাইল, বক্তা নির্ব্বাক্। চিত্রশিল্পী উদ্‌ভ্রান্তদৃষ্টিতে গৃহস্থ সকলের মুখপানে তাকাইল, তারপর ধীরে ধীরে দৃষ্টি নামাইয়া দারুণ বিস্ময়ে নিজের ছবিটী নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কই না, তাহার ছবি তো কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই, তা তো তেমনি সুন্দর, তেমনি মনোহর—তেমনি উজ্জ্বল আছে। চিত্রশিল্পী আনন্দের আবেগে বলিয়া উঠিল, "না, ঠিক আছে!"

পরামর্শ উৎসবের কেন্দ্র সেই ধনী যুবকটী, মামলা-বাজীর সমিতির ভিতর হইতে উঠিয়া সৌৎসুক্যে তাহার দিকে ঝুঁকিয়া বলিলেন "কিহে ব্যাপার কি?"

—কিন্তু ব্যাপার কি, শব্দের উত্তর দৃশ্যের মধ্যেই মিলিল। যুবক দেখিলেন, সে কি চমৎকার চিত্র!—

সদ্য দূরাগত পথ-শ্রান্ত পুত্রকে উৎসুক-নয়না জননী বক্ষে লইবার জন্য প্রসারিত-হস্তে গৃহদ্বারে দণ্ডায়মানা, ঘন-কুঞ্চিত-কেশগুচ্ছ-শোভিত সুকুমার-কান্তি পুত্র হাস্যোজ্জ্বল মুখে দুই হাত বাড়াইয়া ধাইয়া আসিতেছে, কি সুন্দর, কি চমৎকার দৃশ্য! জননীর ললাটে প্রশান্তি

সজল নয়নে উচ্ছ্বসিত আনন্দ, অধরে স্বর্গের সুষমা স্নিগ্ধ হাসি, বক্ষে পরিপূর্ণ মমতা!

যুবক স্তব্ধ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। চিত্রকর উল্লাসদীপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল "ঠিক আছে, আমার 'মাতৃ-স্নেহ' ছবিখানি ঠিকই আছে; ঠোঁটের হাসি টুকুন্ অবধি……!"

যুবক স্তম্ভিত দৃষ্টি তুলিয়া রুদ্ধস্বরে কহিল "শিল্পী—ভাই এ মূর্ত্তি কার?"

শিল্পী মুহূর্ত্ত কাল নীরব রহিল, তার পর গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিল "আমার অন্তরের —আমার ধ্যানের — প্রত্যক্ষ মাতৃস্নেহের!"

সে শব্দ গৃহের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ শব্দ ছাপাইয়া—সমস্ত কলরবের উর্দ্ধে করুণ আবেগে কাঁপিয়া উঠিল! চালবাজ মোক্তারের মাথায় এতক্ষণ যতগুলি ফন্দীর অন্ধি সন্ধি দ্রুত লীলায় ঘুরিতেছিল, সেগুলি মুহূর্ত্তের জন্য—ইন্দ্রজালমুগ্ধ মূঢ়ের মত স্তব্ধ হইয়া গেল!—কিন্তু হায় রে—অভ্যাসের জয়,—সারা জগতের উপর যে মুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিয়া মোক্তারটী প্রবল বিজ্ঞতায় মাথা নাড়িয়া বলিলেন "তোমার কলা কৌশলে বোধ শোধ মন্দ নয়, তবে কি জান, প্রতিপাদ্য বিষয়টা—তেমন কিছু নয়, নেহাৎ হাল্কা!"

শিল্পী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার সেই ক্রূর দম্ভপূর্ণ প্রখর বুদ্ধিজীবী, আইনদক্ষ লোকটার মুখপানে চাহিল!—হাঁ হাঁ ঠিক এমন নিষ্ঠুর স্বার্থ-সর্ব্বস্ব নীচ দৃষ্টি না হইলে কি, চিত্র বর্ণিত দৃশ্যটা তুচ্ছ বেআইনী ব্যাপার বলিয়া ঠাওর করে! ধিক্! শিল্পীর দুই চক্ষু ঘৃণায় জ্বল্‌সিয়া উঠিল, শিল্পী বেগে মুখ ফিরাইল!

কম্পিত কণ্ঠে সেই পয়সাওয়ালা যুবক বলিল "ভাই যত দাম চাও দিতে রাজী, এ চিত্রখানি আমায় দাও।"

শিল্পী গম্ভীর দৃষ্টিতে যুবকের পানে চাহিল, সে চাহনির তেজস্ফুরিত আলোকে যুবকের গোপন মর্ম্মের সমস্ত দৃশ্য যেন প্রত্যক্ষ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! যুবক সহ্য করিতে না পারিয়া অপরাধীর মত মাথা নামাইল, শিল্পী দৃঢ় স্বরে কহিল "না।"

তার পর একটী কথা বলিবার বা শুনিবার অবকাশ রহিল না, শিল্পী গৃহের বাহিরে চলিয়া গেল।

ঘরের নির্লজ্জ লোকগুলা সহসা দুঃসহ অপমান বোধ করিয়া নিষ্ফল ক্রোধে শিল্পীর ও শিল্পের কুৎসা জুড়িল!

(২)

সারা আদালত লোকে লোকারণ্য। আজ মাতা পুত্রের মামলার দিন! সম্পত্তি লইয়া বিবাদ? বাদী পুত্র, প্রতিবাদিনী মাতা! কি কমকাল হুজুক? সারা সহরটা ভাঙ্গিয়া আদালতে আসিয়াছে।

আদালতের কাছে একটা দোকানে কতকগুলি লোক জটলা করিতেছিল। কেহ পান, কেহ তামাক খাইতেছিল, আর গল্প করিতে করিতে হো হো হাসির ঢেউ তুলিতেছিল।

সেই ধনী যুবকটী অত্যন্ত সাধারণ বেশে ম্লান মুখে অন্য দিকে একটা গাছ-তলায় নিঝুম হইয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিলেন। তাঁহার উদ্বেগ-কাতর ললাটে মর্ম্মভেদী বিষাদের অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতেছিল। যুবক কেবলই ভাবিতেছিলেন মানুষ মানুষকে ফাঁকী দিয়া সহস্র সম্পত্তি লইয়া নিজের বাহিরের ভাণ্ডার যতই ভরিয়া তুলুক না কেন—তাহার হৃদয় ভাণ্ডারটা কেবল সেই অগাধ অপরিমেয় অতৃপ্তির দাহ-জ্বালায় ভরিয়া উঠিবে!

মুহ্যমান যুবক নীরবে ভাবিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে শিবিকারোহণে কোন পর্দ্দানসীন মহিলা আদালত গৃহের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলেন, চারিদিক উৎসুক জনতার অস্ফুট গুঞ্জনে ধ্বনিয়া উঠিল—"ঐ—ঐরে!"

দূরাগত অস্ফুট চাঞ্চল্যের মৃত অভিঘাতে যুবক মুখ তুলিয়া চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন? হঁ, হাঁ, কৃতী পুত্রের দুর্ভাগিনী গর্ভধারিণীই আজ অপমান কলঙ্কের বোঝা ঘাড়ে লইয়া রাজকীয় বিচারালয়ের দ্বারে পৌঁছিয়াছেন বটে? আঃ!

যুবকের মস্তিষ্কের ভিতর উচ্ছৃঙ্খল আকুলতার সুরে মর্ম্মভেদী বেদনার ঝঙ্কনা জাগাইয়া তুলিল?......যুবক হৃদয়হীন স্বার্থপরতার দীন বন্ধ কাটাইয়া মুহূর্ত্তে অন্তরের মাঝে সতেজে সোজা হইয়া উঠিল। কোন দিকে না চাহিয়া সহসা তীব্র বেগে ছুটিয়া আসিয়া শিবিকার দ্বার উন্মোচন করিয়া মাতার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়ন ও বিকল কণ্ঠে বলিল "মা—মা, আমায় ক্ষমা কর।"

আকাশস্পর্শী অনির্ব্বাণ বহ্নিশিখার উপর যেন সপ্ত সমুদ্রের শান্তি-নির্ব্বাণ বারি যুগপৎ ঝাঁপাইয়া পড়িল। জননীর চক্ষু জলে পূরিয়া আসিল, তিনি কোন কথা কহিতে পারিলেন না। কেবল সযত্নে পুত্রের মাথাটী বুকে তুলিয়া তাহার উত্তপ্ত ললাটে একটি ক্ষমাপূর্ণ শীতল স্নেহের চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিলেন!

মাতা পুত্রের কাহারই মুখে কথা নাই, কেবল দুইজনেই রুদ্ধ আবেগে বুক-ফাটা অভিমানে অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সে কি গভীর বেদনা! কি নিগূঢ় শান্তি!

খানিক পরে কোথা হইতে সংবাদ পাইয়া সেই আইনবাজ, কর্ত্তব্যপরায়ণ মোক্তারটী এই বে-আইনী ব্যাপারটা সংশোধন করিবার জন্য শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন "ও মশাই শীঘ্রী আসুন, হাকিম এখনি মামলা ধরবেন।"

মুখ ফিরাইয়া তীব্র স্বরে যুবক বলিল "কিসের মামলা? কে ধরে?—আমাদের মামলা রদ্ হয়ে গেছে!"

পশ্চাৎ হইতে মোক্তারের গড়া পেটা চেনা চামুণ্ডার দল কোলাহল করিয়া বলিল "সে কি মশাই, আমরা যে সাক্ষী।

দীপ্ত নেত্রে চাহিয়া যুবক বলিল "চুপ

অপদার্থ ছোট লোকের দল, ঘৃণা হয় না! মাতা পুত্রের মনোমালিন্যের মাঝখানে মালিশীর মুখোস পরিয়া শয়তানী করতে লজ্জা হয় না!—মাতা পুত্রের এ বিবাদ, এ অন্তর-দ্বন্দ্বের ধারা, আজও রাজার আইনে বিধিবদ্ধ হয় নাই, রাজার বিচারালয়ের সাধ্য কি যে আমাদের এ হৃদয়-ভেদী সমস্যায় দন্তস্ফুট করে!—চলে যাও তোমরা, আমার সমস্ত অভিযোগের মীমাংসা সমাধান হইয়া গিয়াছে, সকলের চেয়ে উচ্চ আদালতে—এইখানে!"—যুবক মাতার চরণের নীচে নিজের মাথাটি পাতিয়া দিল।

লোকগুলা মুখ চাওয়া-চায়ি করিয়া পিছু হটিয়া গেল। এ যে অসহ্য বিশ্রী ব্যাপার, কাজের সময় এমন ছেলে-মানুষী! ভারি অন্যায় ছিঃ নেহাৎ বাঁদর।

অন্তরীক্ষে দ্বিপ্রহরের রৌদ্র—তপ্ত পবন কর্কশ কৌতুকে হা হা করিয়া, অট্টহাস্যে প্রশ্ন করিলেন কে—কে—কে!

পুত্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "মা, সব ভুলে যাও"। কোমল কণ্ঠে জননী বলিলেন "ভুলিয়ে তো দিয়েছিস বাবা!"

পুত্র মুখ তুলিয়া চাহিল, হাঁ সেই ক্ষমা—সুন্দর, শান্ত, স্নেহপূত, মাতৃ-মূর্ত্তিই বটে। ললাটে সেই স্বর্গ-সুষমা-দীপ্তি, অধরে সেই অপার্থিব, পুণ্যাম্বিত হাসি! কি অপরূপ লাবণ্য, কি সুমহান্ মাধুর্য্য রে, সমস্ত প্রাণ যে জুড়াইয়া গেল। অন্ধ মূঢ় তাই সে, এত দিন এই ত্রিদিব-বাঞ্ছিত মাতৃস্নেহ সে অবজ্ঞায় পদদলিত করিয়া আসিয়াছে! কি ভ্রম! আজ যে বুদ্ধিমান্ যাই বলে বলুক—সে কিছুতে মানিবে না, মাতৃ-স্নেহ মর-শিল্পীর কল্পনা-সৃষ্ট অলীক বস্তু নয়, তুচ্ছ ব্যাপার নয়।—এ স্বয়ম্ভু সৃষ্ট রমণীয় মহৎ ব্যাপার!

মানুষ যখন শ্রেয়ঃর মহিমা ভুলিয়া প্রেয়ঃর চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া রসা-তলের দিকে অগ্রসর হয়, তখন যে শক্তি শুভ সহৃদয়তার বলে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া ফিরিবার শক্তি সৃজন করিয়া দেয় তাহাই তো শিল্প, তাহাই তো সার্থক! তাহা যে সহস্র যুগ ধরিয়া, সহস্র হৃদয়ের সহস্র চিন্তা-বিকশিত অভিজ্ঞতার কল্যাণ ভাগিনী! অমৃতের মত চিরদিনই সাহিত্যে, শিল্পে, চিত্রে, কলা কৌশলে, তাহা সহস্র ধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে। অত্যন্ত বুদ্ধি-মান সত্যকার অবর-অম্‌কাল আস্ফালন-কারী কাজের লোক তাহা কিছু নয় বলিয়া উড়াইয়া দিক্—কিন্তু হৃদয়ের 'নিরিখের' কাছে সেই মুখের কিছু নয়, সত্যের কিছু নয় বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া যায়। তাহাকে আটকাইবার সাধ্য কাহারও নাই।

যুবক স্তব্ধ-মুগ্ধ-নীরব।—অকস্মাৎ নিবিড় নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া একখানি প্রসারিত চিত্র হস্তে এক তরুণ, সুন্দর মূর্ত্তি সম্মুখে আসিয়া হর্ষ-বিকম্পিত স্বরে বলিল "এই নিন্ মশায়, আপনার সেই ছবি!"

যুবক চকিতে দেখিলেন সেই সবাই-খানার শিল্পী। বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া

তিনি সানন্দে বলিয়া উঠিলেন "একি তুমি—এখানে!—"

প্রসন্ন উজ্জ্বল হাস্যে শিল্পী বলিল "হাঁ ছবিতে আজ আমার রং ফলান শেষ হয়েছে, তাই আপনাকে দিতে এসেছি।"

যুবক আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "তুমি যে বলেছ আমায় দেবে না।"

"হাঁ সেদিন আপনার মুখ দেখে মনে হয়েছিল, এ চিত্রের মর্ম্ম আপনি বোঝেন নি, আজ আমার ভ্রম গেছে, ক্ষমা করুন, আমার চিত্র আজ বাস্তবের মধ্যে সার্থক হয়েছে।"

যুবক শ্রদ্ধা-মুগ্ধ দৃষ্টিতে একবার শিল্পীর পানে চাহিলেন, একবার চিত্রের পানে চাহিলেন, তার পর আবেগপূর্ণ দৃষ্টিতে জননীর স্নেহোজ্জ্বল মুখের পানে চাহিলেন। অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তরুণ শিল্পীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বাষ্পরুদ্ধ স্বরে কহিলেন তুমিই জ্ঞানদাতা গুরু,—সহৃদয় সহোদর! সংসারে তুমিই ধন্য!

যুবা ধূলার উপর জানু পাতিয়া বসিয়া সেই চিত্র মাথার উপর তুলিয়া লইলেন।

চারি দিকের জনতা মুগ্ধ, স্তম্ভিত।

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

শিখগ্রন্থ—সুখমণি সাহিব।

৯ শ্লোক।

উর ধারৈ যো অন্তর নাম।
সরব মৈ পে মৈ ভগবান্।
নিমখ নিমখ ঠাকুর নমস্কারে।
নানক ওহে অপরস সগল নিসতারৈ॥

যিনি নামকে হৃদয়ে ধারণ করেন,
তিনি সকল বস্তুতেই ভগবান্‌কে দর্শন করেন।
তিনি প্রতি নিমেষে ঠাকুরকে নমস্কার করেন।
নানক বলিতেছেন, তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি সকলকে উদ্ধার করেন॥

অষ্টপদী।

মিথিয়া নাহি রসনা পরশ।
মন মহি প্রীতি নিরঞ্জন দরশ॥
পরত্রিয় রূপ ন পেখৈ নেত্র।
সাধকী টহল সন্ত সঙ্গ হেত॥
করণ ন শুনৈ কাহুকি নিন্দা।
সভতে জানৈ আপস কউ মংদা॥
গুরু প্রসাদি বিখা পর হরৈ।
মন কি বাসনা মনতে টরৈ॥
ইন্দ্রী জিত পঞ্চ দোখতে রহত।
নানক কোটী মধ্যেকো ঐসা অপরস ॥১॥

যার রসনা মিথ্যা স্পর্শ করে না,
যার মনে নিরঞ্জন দর্শনে প্রীতি,
যার নেত্র পরস্ত্রীর রূপ দর্শন করে না,
যে সাধু সেবা করে এবং সাধু সঙ্গে যার প্রীতি,
যার কর্ণ কাহারও নিন্দা শুনে না,

যে আপনাকে সকলের অপেক্ষা নীচু জানে,
গুরুপ্রসাদে যে বিষয়-বাসনা ছাড়িয়াছে,
যে মনের বাসনা মনেই মিটাইয়া লয়,
যে ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে, এবং পঞ্চ দোষ
যাহার দূর হইয়াছে,
নানক বলিতেছেন, এমন ব্যক্তি কোটির
মধ্যে একজন পাওয়া যায় ॥১

বৈষনী সো যিস উপর সুপ্রসংন।
বিষণ কী মায়াতে হোয় ভিংন ॥
কর্ম্ম করত হোবৈ নিহ কর্ম্ম।
তিস বৈষনী কা নির্ম্মল ধর্ম্ম ॥
কাহু ফল কী ইচ্ছা নহি বাছৈ।
কেবল ভগতি কীরতন সঙ্গ রাচৈ ॥
মন তন অন্তরি সিমরন গোপাল।
সভ উপর হোবত কিরপাল ॥
আপি দৃড়ৈ অবরহ নাম জপাবৈ।
নানক ওহ বৈষনী পরমগতি পাবৈ ॥২

সেই বৈষ্ণব, যার প্রতি প্রভু সুপ্রসন্ন।
তিনি বিষ্ণুমায়া হইতে ভিন্ন।
তিনি নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিয়া যান।
তাঁহার স্বভাব অতি নির্ম্মল
কোন ফলেরই তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না।
তিনি ও কেবল ভক্তি কীর্ত্তনেই মগ্ন থাকেন।
তাঁহার শরীর এবং মন কেবল গোপালের
স্মরণেই নিযুক্ত।
সকলের উপরেই তিনি দয়ালু।
আপনি দৃঢ় রূপে নামকে ধরিয়া থাকেন
এবং অপরকে নাম জপান।
নানক বলিতেছেন, এমন বৈষ্ণব পরম
গতি পাইয়া থাকেন ॥২

ভগউতী ভগবন্ত ভগতি কা রঙ্গ।
সগল তিয়াগৈ দুসট কা সঙ্গ ॥
মনতে বিনসৈ সগলা ভরম।
করি পূজে সগল পারব্রহ্ম ॥
সাধ সঙ্গি পাপা মল খোবৈ।
তিস ভগউতী কী মতি উতম হোবৈ ॥
ভগবন্ত কী টহল করৈ নিত নীতি।
মন তন অরপৈ বিষণ প্রীতি ॥
হরিকে চরণ হিরদৈ বসাবৈ।
নানক ঐসা ভগউতী ভগবন্ত কউ পাবৈ ॥৩

সেই ভাগবত, ভগবানের ভক্তিতে যার
আনন্দ,
যে সকল প্রকার দুষ্ট সঙ্গ ত্যাগ করে,
যে মন হইতে সকল ভ্রম নাশ করে,
যে সকল বস্তুতে পরব্রহ্ম জানে পূজা
করে,
এবং যে সাধুসঙ্গে পাপের মল দূর করে।
সেই ভক্তেরই মতি উত্তম হয়,
সে ভগবানের সেবা নিত্য নিত্য করে,
সে শরীর মন বিষ্ণুর প্রীতিতে অর্পণ
করে,
সে হরির চরণ হৃদয়ে ধারণ করে।
নানক বলিতেছেন, এইরূপ ভক্তই ভগ-
বান্‌কে প্রাপ্ত করেন ॥৩

সে পণ্ডিত যো মন পরবোধৈ।
রাম নাম আতম মহি সোধৈ ॥
রাম নাম সার রস পীবৈ।
উস পণ্ডিত কৈ উপদেশ জগ জীবৈ ॥
হরি কি কথা হির দৈ বসাবৈ।
সে পণ্ডিত ফির যোনিন আবৈ ॥
বেদ পুরাণ সিমৃত বুঝৈ মূল।
সূখম মহি জানৈ অস্থূল ॥

চাহু বরনা কউ দে উপদেশ।
নানক উস পণ্ডিত কউ সদা আদেশ ॥৪
সেই পণ্ডিত যে মনে সন্তোষ রাখে এবং যে আপনাকে শোধন করিবার জন্য রাম-নাম করে।
যে রাম-নাম সার রস পান করে,
সেই পণ্ডিতের উপদেশে জগৎ বাঁচিয়া থাকে।
যে পণ্ডিত হরি-কথা হৃদয়ে বসায়,
সে আর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে না।
সে বেদ পুরাণ ও স্মৃতির মূলকে বুঝিতে পারে,
সে সূক্ষ্মমধ্যে স্থূল ব্রহ্মাণ্ডকে দেখে,
সে চারি বর্ণকে উপদেশ প্রদান করে।
নানক বলিতেছেন, সেই পণ্ডিতকে সদা নমস্কার ॥৪
বীজ মন্ত্র সরব কউ গ্যান।
চাহু বরনা মহি জপৈ কেউ নাম ॥
যো যো জপৈ তিসকী গতি হোয়।
সাধ সঙ্গি পাবৈ জন কোয় ॥
করি কিরপা অন্তরি উর ধারৈ।
পশু প্রেত মুঘদ পাথর কউ তারৈ ॥
সরব রোগ কা ঔখধ নাম!
কলিয়ান রূপ মঙ্গল গুণ গাম ॥
কাহু যুগত কি তৈ ন পাই ঐ ধর্ম্ম।
নানক তিস মিলৈ যিস লিখিয়া ধুর কর মি ॥৫
বীজ মন্ত্র সকল জ্ঞানের সার।
চারি বর্ণের মধ্যে ভাগ্যক্রমে কেহ কেহ নাম জপ করে।
যে জপ করে তার গতি হয়।
সাধুসঙ্গে কোন কোন ভাগ্যবান্ নাম লাভ করে।
নাম ব্রহ্ম কৃপা করিয়া হৃদয়ে স্থান গ্রহণ করেন,
পশু, প্রেত, মূঢ় এবং পাথরকে তরান।
নাম, সকল রোগের ঔষধ।
ইহা কল্যাণকর এবং মঙ্গলের আধার।
কোন প্রকার যুক্তি বা ধর্ম্মকার্য্যে আসল ধর্ম্ম লাভ হয় না।
নানক বলিতেছেন, সেই সে বস্তু লাভ করে, যার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ॥৫
যিসকে মনে পার ব্রহম কা নিবাস।
তিসকা নাম সতি রামদাস ॥
আতম রাম তিস নদরী আয়া।
দাস দসংতণ ভায় তিন পায়া ॥
সদা নিকট নিকট হরি জান।
সোদাস দরগহ পরবান ॥
অপুনৈ দাস কউ আপি কিরপা করৈ।
তিস দাস কউ সভ সোঝি পরৈ ॥
সগল সংগি আতম উদাস।
ঐসী যুগতি নানক রামদাস ॥৬
যাঁর মনে পরব্রহ্মের বাস,
তাঁর নাম সত্য রামদাস।
আত্মারাম তাঁর দৃষ্টিপথে আসেন।
সেই ভক্ত দাসের দাস হয়ে তাঁহাকে লাভ করেন।
তিনি হরিকে সর্ব্বদা নিকটে বলিয়া জানেন।
সেই দাস ভগবানের দ্বারে সম্মানিত হন।
প্রভু আপনার দাসকে আপনি কৃপা করেন।

সেই দাসের দৃষ্টিপথে সকল বস্তু আসে।
তিনি সকলের মধ্যে থাকেন অথচ নিঃসঙ্গ।
নানক বলিতেছেন, রামদাসের এইরূপ
বুক্তি ॥৬

প্রভু কি আজ্ঞা আতম হিতাবৈ।
জীবন মুকতি সোউ কহা বৈ ॥
তৈসা হরষ তৈসা উস শোগ।
সদা অনংদ তহ্ন ন বিয়োগ ॥
তৈসা সুবরণ তৈসা উস্ মাটী।
তৈসা অমৃত তৈসী বিষ খাটী।
তৈসা মান তৈসা অভিমান।
তৈসা রংক তৈসা রাজন ॥
যো বরতায় সাই যুগত।
নানক উহ পুরুষ কহিয়ৈ জীবন মুকত ॥৭

যে আত্মার হিতের জন্য প্রভুর আজ্ঞার
অনুসরণ করে, তাহাকে জীবনমুক্ত বলে।
তাহার পক্ষে যেমন হর্ষ তেমনি শোক,
সে সদাই আনন্দে মগ্ন, ভগবান হইতে
বিচ্যুত হয় না।
তার কাছে স্বর্ণ এবং মাটি সমান।
তার কাছে অমৃত এবং বিষ সমান।
তার কাছে মান এবং অপমান দুই সমান।
তার কাছে যেমন ভিখারী তেমনি রাজা।
যার এইরূপ যুক্তি আছে,
নানক বলিতেছেন, সেই জীবনমুক্ত ॥৭

পার ব্রহমকে সগলে ঠাউ।
যিত যিত ঘর রাখৈ তৈসা তিন নাউ ॥
আপে করণ করাবন যোগ।
প্রভ ভাবৈ সেই ফুনি হোতা ॥
পসরিয়ো আপ হোয় অনন্ত তরঙ্গ।
লখে ন যাহি পারব্রহমকে রঙ্গ ॥
যৈসী মত দেয় তৈসা প্রগাশ।
পারব্রহম করতা অবিনাশ ॥
সদা সদা সদা দয়াল।
সিমর সিমর নানক ভয়ে নিহাল ॥৮

পরব্রহ্মের আবাস সকল স্থান।
যেমন যেমন স্থানে জীবকে রাখেন,
তেমনি তেমনি নামকরণ করেন।
তিনি আপনিই সৃষ্টি করিতে পারেন এবং
সৃষ্টি করেন।
যাহা তিনি ভাবেন, তাহাই হয়।
তিনি আপনাকে প্রসারিত করিয়া অনন্ত
হন।
তাঁহার রঙ্গ মনে ধারণা হয় না।
যার যতটুকু বুঝিবার শক্তি দেন সে তত-
টুকু বুঝে।
সেই কর্ত্তা পরব্রহ্ম অবিনাশী।
নানক বলিতেছেন, সর্ব্বদা তাঁহার ভাবনা
করিয়া কৃতার্থ হইলাম ॥৮

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত।

৺উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

(তাঁহার লিখিত ডায়েরী।)

ধৈর্য্য।

"তরোরিব সহিষ্ণুনা"।

তরুর ধৈর্য্য কেহ কি চিন্তা করিয়াছেন? গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে অগ্নিবাহে—তরু দহ দগ্ধ হইতেছে, বৃক্ষ অটল ভাবে দণ্ডায়মান—ঝড় বৃষ্টি সহ্য করিতেছে—দারুণ শীতের নিহারে তাহাকে পত্রহীন করিয়াছে—অবাক্। কিন্তু বৃক্ষ সমুদয় শক্তি দিয়া পৃথিবী ধরিয়া আছে এবং সজোরে রস আকর্ষণ করিতেছে। বসন্তের মৃদু মলয় ভ্রমরগুঞ্জন—বিশ্বাসী জীবন তো এইরূপ হইবে।

১। আমরা যে সংসারে বাস করিতেছি, এখানে নিজের ইচ্ছামত সব কার্য্য হয় না, পদে পদে আমাদের ইচ্ছা বিফল হয়। ধৈর্য্য ধর।

২। রোগ, শোক, দারিদ্র্য, বিপদ, এত ধৈর্য্য ধরা।

৩। পরিবার, জনসমাজ, লোক সকলের সঙ্গে ব্যবহার।

৪। ধৃতি ক্ষমা দমোস্তেয়ং—অধিকাংশ ধৈর্য্য শিক্ষা।

৫। ধর্ম্ম সংগ্রামের ব্যাপার—পরীক্ষা।

সুশীলেরা ধর্ম্ম করেন—স্বর্গরাজ্য তাঁহাদের।

সাধু লোকের জীবনে ধৈর্য্যের দৃষ্টান্ত—বিশিষ্ট।

ঈশ্বরের ধৈর্য্য। আমরা এক একটী পাপ করি তাঁহাকে আঘাত করিয়া।

স্ত্রীলোকের সতীত্ব পতির প্রতি এক মন। তাহার রাগ, হিংসা, সহস্র দোষ থাকিলেও সে সতী।—

ঈশ্বরকে আপনার গতি মুক্তির কারণ বলিয়া যে একমনে তাঁহাকে চায়, সেই ভক্ত, তাহার আর সহস্র দোষ থাকিলেও সে ভক্ত। এক নিষ্ঠা—

মানুষ নিষ্পাপ হইয়া ঈশ্বর সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। যে যে অবস্থায় থাকুক, তাহাতেই সে ঈশ্বর সাধনে অধিকারী হইতে পারে। কিন্তু সৎপতির অনুগত হইলে রমণী যেমন তাহার গুণ প্রাপ্ত হয়, ঈশ্বরে তদ্‌গতচিত্ত হইলে সকল দোষ গিয়া প্রাণ বিশুদ্ধ হয়।

সত্যং শিবং সুন্দরং দেবতাতে যে অনুরক্ত হয় অসত্য, অকল্যাণ, অপ্রেম লইয়া সে সুখী হইয়া থাকিতে পারে না। তাহার আপনার চরিত্রকে পবিত্র করিবার জন্য ব্যাকুলতা হয়।

দুরন্ত ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তিগণকে বলদ্বারা দমনের আশা বিফল, কিন্তু প্রেমের আকর্ষণে হয়। বন্য হরিণকে কাটগড়ায় পুরিয়া প্রহারে স্থির করা যায় না, কিন্তু বংশীর ধ্বনিতে সে এমন মুগ্ধ হয় যে, প্রহারেও নড়ে না।

একনিষ্ঠ হইতে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপান, ক্রমে মধুর হয়, প্রেমের সঞ্চার হয়, তখন পাপের সংস্পর্শ ভাল লাগে না।

প্রেমময়কে হৃদয় সিংহাসনে বসাইতে হইলে ইহাকে নির্ম্মল করিতে হয়, তাঁহাকে মলিন হৃদয়ে ধরিয়া তাঁহাকে অসুখী করিতে ক্লেশ অনুভব করে।

আত্মহারা হইয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করে।

বারাণসী-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বালুসাই প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত বস্তুর আবশ্যক :—

	টা	আ	পা
ময়দা ২॥০ সের, মূল্য	০	৪	০
ঘৃত ৩ সের (মিশ্রি ঘি)	১	১৫	০
চিনি ২॥০ সের	১	৪	০
গন্ধ দ্রব্য	০	০	১
জালানী কাষ্ঠ	০	১	০
মোট	৩	৮	১

উক্ত উপকরণে দশ সের বালুসাই প্রস্তুত হইবে। ময়রা টাকায় ২॥০ সের এবং ফেরিওয়ালা সওয়া দুই সের বিক্রয় করিয়া থাকে। ময়রা পৌনে আট আনা এবং ফেরিওয়ালা সাত আনা লাভ করিয়া থাকে।

প্যাঁড়া প্রস্তুতের উপকরণ :—

	টা	আ	পা
খির (জমাট বাঁধা)			
সওয়া ছয় সের দাম	২	৩	০
চিনি ৫ সের	২	৮	০
পেস্তা ২ ছটাক "	০	১	২
জালানী কাষ্ঠ	০	১	০
মোট	৪	১৩	২

উক্ত উপকরণে ১১ সের প্যাঁড়া প্রস্তুত হইবে। ময়রা টাকায় দুই সের এবং ফেরিওয়ালা পৌনে দুই সের বিক্রয় করে। এই হিসাবে ১১ সেরে ময়রার লাভ সাড়ে দশ আনা এবং ফেরিওয়ালার সাড়ে বার আনা।

লাড্ডু খাইতে মন্দ নহে। তবে বাঙ্গালীর রুচি অন্যরূপ। হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে লাড্ডুর আদর অধিক। ইহার উপকরণাদি :—

	টা	আ	পা
বাসম ৪ সের মূল্য	০	৪	০
ঘি ৩ সের ২ ছটাক (খারাপ)	২	০	২
চিনি ২ নম্বরের ৫ সের	১	৯	০
কিসমিস	০	৪	০
জালানী কাষ্ঠ	০	১	০
মোট	৪	২	২

উক্ত উপকরণে সাড়ে ১২ সের লাড্ডু প্রস্তুত হইবে। ময়রা স্বয়ং বিক্রয় করিলে টাকা প্রতি ২॥০ সের লাড্ডু বিক্রয় করে এবং ফেরিওয়ালা সওয়া দুই সের। ইহাতে ময়রার লাভ সাড়ে তের আনা ও ফেরিওয়ালার সাড়ে আট আনা।

লুচিকে পুরী বলে। বাঙ্গালা দেশে লুচির উপকরণ ময়দা কিন্তু এদেশে আটা। আটার লুচি খাইতে সুস্বাদ নহে, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর পক্ষে। এদেশে কিন্তু পুরীর আদর খুবই অধিক। পুরী ক্রয় করিলেই তাহার সহিত তরকারীটা পাওয়া যায়। তরকারীটা ফাও।

পুরী প্রস্তুতের উপকরণ :—

	টা	আ	পা
আটা ১৪ ছটাক মূল্য	০	১	০
ঘি আড়াই ছটাক	০	১	২
তরকারীর জন্য শাক সব্জি ও আচার	০	০	১
জিরা	০	০	১
জ্বালানী কাষ্ঠ	০	০	১
মোট	০	৩	১

উক্ত উপকরণে দেড় সের পুরী প্রস্তুত হইবে। ময়রা সাড়ে চারি আনায় এক সের পুরী বিক্রয় করে, তাহাতে তাহার চারি আনা লাভ হয়। ফেরিওয়ালা পাঁচ আনায় এক সের বিক্রয় করে, তাহাতে তাহার লাভ নয় আনা।

ময়রা মিষ্টান্নের রস ধৌত করিয়া ফেলিয়া দেয় না। ধৌত পদার্থটা জমা করিয়া তাহা হইতে সির্কা প্রস্তুত করে। সেই সির্কা দ্বারা তাহাদিগের চাট্‌নি বা আচার প্রস্তুত হইয়া থাকে। সির্কা প্রস্তুতের প্রণালী এই :—যত রস তাহার দ্বিগুণ জল মিশ্রিত করিয়া একটা নাদে ভরিয়া মাটিতে পুঁতিয়া ফেলে। এরূপ অবস্থায় নাদটী মৃত্তিকামধ্যে পাঁচ মাস কাল প্রোথিত থাকে। মধ্যে এক দিন তৃতীয় মাসের অন্তে নাদটী উঠাইয়া পদার্থটি ছাঁকিয়া লয়। নাদে যদি পদার্থটী পৌণে দুই মণ থাকে, তবে তাহা হইতে এক মণ উত্তম সির্কা এবং ত্রিশ সের মধ্যম সির্কা পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্তটির দর চারি পয়সায় এক সের এবং শেষোক্তটীর দর দুই পয়সা।

ময়রারা বাতাসাও প্রস্তুত করিয়া থাকে। কাঁচা চিনি এক মন কিনিয়া তাহাতে জল মিশ্রিত করিয়া কড়ায় চড়াইয়া দেয়। যখন তাহা ফুটিয়া ফুটিয়া গাঢ় হইয়া আইসে, তখন তাহা হইতে কিয়দংশ লইয়া একটা ছোট কড়াইতে রাখে। এই ছোট কড়াই "দোহরা" নামে খ্যাত। ইহাতে কাষ্ঠনির্ম্মিত একটা লম্বা হাণ্ডল থাকে। রসটাকে দোহরায় পুনরায় পাক করা হয়। যখন তাহা গাঢ় হইতে আরম্ভ হয় তখন ময়রা দোহরাকে উত্তোলিত করিয়া "কত্তরণীর" সাহায্যে কাষ্ঠনির্ম্মিত হাণ্ডেলের গাত্রে কাটিতে থাকে। "কত্তরণী" একপ্রকার ছুরির নাম। নিম্নদেশে এক খানা কাপড় পাতিয়া

জমান যায়। উত্তম রসটায় বাতাসা হইয়া থাকে। যে রসটা বাকী থাকে তাহাকে কড়াতে জমিতে দেওয়া হয় এবং তৎপরে তাহাকে উঠাইয়া লইয়া সূতার ন্যায় টানা হয়। এইরূপে তাহা দড়ির ন্যায় হইয়া যাইলে পরে তাহাকে কাটিয়া লওয়া হয়। ইহাই খুটিয়া নামে খ্যাত। বাতাসা প্রস্তুত করিতে যে কাঁচা চিনি ব্যবহৃত হয় তাহাতে মণ প্রতি সাড়ে চারি সের বাতাসা প্রস্তুত হইলে ক্ষতি হইয়া থাকে। দেড় মণ কাঁচা চিনির মূল্য ১৪ টাকা মণ হিসাবে ২১ টাকা পড়ে। ঘুঁটে খরচ ৪ আনা এবং বাতাসা অন্যান্য দোকানে যোগাইবার জন্য চারিজন চাকরের আবশ্যক হয়। প্রত্যেক জনের পারিশ্রমিক দুই আনা হিসাবে ৮ আনা পড়ে। সর্ব্ব শুদ্ধ খরচ ২১ টাকা ১২ আনা। ইহাতে সওয়া ষাট সের বাতাসা ও পৌনে চারি সের খুটিয়া প্রস্তুত হইবে। টাকা প্রতি ২৷৷০ সের বাতাসা বিক্রয় হইলে ২৪ টাকা ৪ আনা ৯ পাই দরে বিক্রয় হইবে। খুটিয়া টাকায় পাঁচ সের বিক্রয় হয়। এই হিসাবে পৌনে চারি সের খুটিয়ার দাম ১২ আনা। সর্ব্বশুদ্ধ বিক্রয়ের দাম ২৫ টাকা ৯ পাই।

আচার বিক্রেতা, আচার, চাটনি ও মোরব্বা প্রস্তুত করিয়া থাকে। সোহারা, কিসমিস্, লেবু, কাঁঠাল, আদ্রক, শালগম, শশা, পেঁপে, কমলা লেবু, পেটা, আমলকী, হরিতকী, নাসপাতী, বিবি, বাঁশ, সেব, আনারস, পেয়ারা, তেঁতুল প্রভৃতি উক্ত বস্তুর উপাদান স্বরূপ হইয়া থাকে। সিরাপ প্রস্তুত করিতে হইলে চিনি ও লেবুর রসের আবশ্যক হয়। শেষোক্তটী পূর্ব্বোক্তটির সহিত মিশ্রিত করা হয় না। সেবের চাটনি হইলে চিনির রসের সহিত লেবুর রসের সংমিশ্রণ আবশ্যক।

এক সের মোরব্বার মূল্য বস্তু বিশেষে ৮ আনা, ১২ আনা এবং ১ টাকা। আদ্রকের মোরব্বা ১২ আনায় সের। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে তিন পোয়া খাঁড় (চিনি) ও আধ সের আদার আবশ্যক। পূর্ব্বোক্তটী ৫ আনায় ও শেষোক্তটি দুই আনায় পাওয়া যায়। চিনিকে সওয়া দুই সের জলে মিশ্রিত করিয়া অধিক উত্তাপে ফুটাইতে হইবে। যতক্ষণ না রসটা গাঢ় হইয়া হাতায় লাগে ততক্ষণ উহা অধিক উত্তাপে রাখা আবশ্যক। যখন দেখিবে রসটা হাতার গায়ে এমন ভাবে লাগিয়াছে যে তাহা টানিয়া উঠাইতে পারা যায় তখনই জানিবে রসটা ঠিক হইয়াছে। আদাকে তৎপরে জলে সিদ্ধ করিয়া যখন নরম ও অনাবিল দেখিবে তখন উক্ত রসে ফেলিয়া দিবে। এক পয়সার কেওড়া তাহাতে মিশ্রিত করিলেই বেশ সুগন্ধ বিশিষ্ট হইবে। এই মোরব্বায় সওয়া সাত আনা খরচ পড়ে। ইহাতে জালানী কাষ্ঠের খরচ আরও এক আনা যোগ কর। সর্ব্বশুদ্ধ খরচ সওয়া আট আনা। মোরব্বাটী বিক্রয় হইবে বার আনায়।

গৃহ কর্ম্ম।

নারিকেলের পরমান্ন।

প্রথমতঃ একটী নারিকেল উপর উপর কুরিয়া লইয়া (এমন ভাবে কুরিতে হইবে যেন তলার খোলা না বাহির হয়) উহা পরিষ্কার শিলে মিহি করিয়া বাঁটিয়া লও, অর্দ্ধ পোয়া ছানা বাঁটিয়া পৃথক রাখ, অর্দ্ধ ছটাক বাদাম, এক ছটাক কিস্‌মিস ঘৃতে অল্প ভাজিয়া লইয়া, বাদাম ভাজাগুলিকে কুচাও, তৎপরে এক সের দুগ্ধ এক পোয়া চিনি মিশ্রিত করিয়া ঘন করিয়া জাল দাও। অল্প ঘন হইয়া আসিলে সেই দুগ্ধে ভাজা বাদামের কুচি ও কিস্‌মিস্‌গুলি ফেলিয়া দিয়া একবার ফুটিয়া উঠিলে তাহাতে ছানা বাটাটী ফেলিয়া দিয়া হাতা দ্বারা মিশাইয়া দাও। ছানা বেশ মিশিয়া যাইলে পর নারিকেল ফেলিয়া দিয়া নাড়িতে থাক। যখন দেখিবে উহা ঘন আটার ন্যায় হইয়াছে তখন নামাইয়া লইয়া তাহাতে আরও অর্দ্ধ ছটাক বাদাম বাটা মিশ্রিত করিবে। পরে উহাতে দুইটি বড় এলাইচের গুঁড়া ও অল্প পরিমাণে কর্পূর ছড়াইয়া দিবে। কর্পূর বেশী দিলে তিক্ত হইয়া যাইবে।

যে পরিমাণে দুগ্ধ লওয়া হইবে, সেই পরিমাণে অন্যান্য জিনিষগুলিও লইতে হইবে।

চোষির পরমান্ন।

এক ছটাক ময়দা জল দিয়া মাখিয়া ছোট ছোট ধানের ন্যায় পুলির আকারে পাকাইতে হইবে, তৎপরে সেইগুলি রৌদ্রে শুকাইবে। এই শুক ময়দার পুলি গুলিকে চোষি বলে। চোষি গুলিকে ঘৃতে ভাজিয়া রাখিবে, এমন ভাবে ভাজিতে হইবে যেন লাল না হইয়া যায়। এদিকে এক সের দুগ্ধ আগুণে চড়াইয়া তাহাতে চিনি তিন ছটাক ও কিস্‌মিস্‌ এক ছটাক দিয়া দিবে। দুগ্ধ যখন মরিয়া তিন পোয়া আন্দাজ হইবে তখন চোষিগুলি তাহাতে ফেলিয়া দিবে। চোষিগুলি দুগ্ধের সহিত ফুটিয়া ফুটিয়া যখন দুগ্ধ ঘন আটার ন্যায় হইবে তখন নামাইয়া গরম থাকিতে থাকিতে বাদাম অর্দ্ধ ছটাক, পেস্তা সিকি ছটাক কুচাইয়া ফেলিয়া দিবে। শেষ কালে অল্প পরিমাণে গোলাপ জল উপরে ছড়াইয়া দিলেই অতি উপাদেয় রসনার তৃপ্তিকর পরমান্ন প্রস্তুত হইবে।

এক সের দুধের পরমান্নের অন্যান্য জিনিষের পরিমাণ উপরে যেরূপ লিখিত হইয়াছে তদনুযায়ী হইবে।

প্রবীনা গৃহিণী শ্রীমৃ—স।

—

গত মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। মনুষ্য। | ২। চিন্তা।

সমালোচনা।

বঙ্গ মহিলা—বৈশাখ ১৩২২ সাল, ১ম সংখ্যা, ১ম বর্ষ—স্ত্রীপাঠ্য মাসিক পত্রিকা। শ্রীঅভিলাষ চন্দ্র সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃক সম্পাদিত। প্রবন্ধগুলি মহিলাদিগের উপযুক্ত। পত্রিকা খানি স্থায়ী হইলে নারীগণের সেবা করিতে সক্ষম হইবে আশা করা যায়।

নূতন সংবাদ।

স্বর্গীয় এ, শ্রীনিবাস রাও মহোদয়ের পত্নী শ্রীমতী শকুন্তলা বাই স্বামীর স্মৃতি চিহ্ন স্থাপনার্থ মহীশূর রাজ্যে নিরন্ন পিতৃমাতৃহীনদিগের জন্য একটী বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদের প্রতিপালনের জন্য অর্থ দান করিয়াছেন।

২। গত বৎসরের ৪ঠা আগষ্ট তারিখে ইংলণ্ড জর্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে এ বৎসর ৪ঠা আগষ্ট সমগ্র দেশময় মঙ্গলানুষ্ঠান হইয়াছে।

৩। সম্প্রতি পাতিয়ালায় মার্ব্বেল প্রস্তরের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আধুনিক ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে খনি হইতে প্রস্তর তুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই খনি হইতে নানারূপ বিচিত্রবর্ণ প্রস্তর পাওয়া যাইতেছে।

৪। বালেশ্বর, পটুয়াখালি প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। অনেক স্থান জল প্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছে। এই সকল স্থানের লোকদিগের কষ্ট দূরীকরণার্থ গবর্ণমেণ্ট ও সদাশয় জমীদারবর্গ যথা সাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

৫। বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল ঢাকার সেবাশ্রমে ২৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৬। গোলা নির্ম্মাণের নিমিত্ত বেঙ্গল টেক্নিক্যাল ইনষ্টিটিউট গবর্ণমেণ্টকে কতকগুলি যন্ত্র দিয়াছেন।

৭। কুমারী নাইটিঙ্গেল ইউরোপে যে সেবাধর্ম্মের মহান আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, সম্প্রতি রাজকুলের মহিলারাও

সেই মহান আদর্শের অনুসরণ করিয়া সেবা ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন। রুষ সম্রাজ্ঞী ও তাঁহার কন্যাগণ যুদ্ধে আহত সৈনিক দিগের সেবা করিতেছেন। ইংলণ্ডের রাজপরিবারস্থ মহিলাগণও এই কার্য্যে যোগ দিয়াছেন।

ভুত না মানুষ।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

চন্দনী—বন্দিনী।

চন্দনী বন্দিনী হইয়া এই অপরিচিত স্থানে আনিত হইয়াছেন। কতক্ষণ তিনি বন্ধন দশায় ছিলেন ও অজ্ঞান হইয়া ছিলেন তাহা তিনি বলিতে পারেন না। কিন্তু চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়াই দেখিলেন, তিনি বন্ধনমুক্ত হইয়াছেন। অতঃপর তিনি উঠিয়া বসিলেন। তিনি একখানি ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র পালঙ্কে শায়িতা ছিলেন। ঘরখানি নিতান্ত অপরিস্কার নহে। শয্যাতে কাঠিণ্যতা অথবা দুর্গন্ধ ছিল না। তিনি উপবেশন করিয়াই আহারের উপযুক্ত নানাবিধ সামগ্রী দেখিতে পাইলেন। কিন্তু ক্ষুধা ও পিপাসা উপলব্ধি করা সত্তেও তিনি পানাহার না করিয়া চারিদিক দেখিতে দেখিতে গৃহ হইতে বহির্গমনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি শীঘ্রই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গৃহের পশ্চাৎদিকে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং তথাকার নির্জ্জন প্রকৃতির অপরূপ শোভা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন। প্রকৃতির নির্জ্জনতার অংশটুকু বিধাতা কি স্বর্গীয় মধুরতা দিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন! এই স্থানের নির্জ্জন সৌন্দর্য্য সত্য সত্যই মনে প্রাণে ঈশ্বরের সত্বা জাগাইয়া তোলে। তদ্দর্শনে চন্দনীর প্রাণে ঈশ্বর ভক্তি জাগিয়া উঠিল। তিনি ভগবানের নিকট এইরূপে নিবেদন করিতে লাগিলেন।

যদি তুমি না দেও দেখা
তাতে কোন ক্ষতি নাই।
দান করি নাম সুধা
বিনাশ করেছ ক্ষুধা
অধম অধমাধম
ধন্য হইছি তাই।
পাপ পরিশুন্য হয়ে
গাহিব আনন্দ ভয়ে
নিরজনে নিরিবিলি
প্রেমাশ্রু পড়িবে গলি।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

তাহার নয়ন বহিয়া প্রেমাশ্রু পড়িতে লাগিল। ইহার একটু দূরবর্ত্তী স্থান দিয়া একটি স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইতেছিল। চন্দনীর দৃষ্টিপথে তাহা পতিত হইল। তিনি ধীরে ধীরে সেই নদীর তীরাভিমুখে চলিলেন। কেহই তাঁহার গমনে বাধা দিল না সত্য কিন্তু

একজন ধনবান বলিষ্ঠকায় যুবা পুরুষ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। চন্দনী সেই পশ্চাৎবর্ত্তী যুবকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই আপনার দুরবস্থার বিষয় সম্যক বুঝিতে পারিলেন। তিনি আপন বস্ত্রাভ্যন্তরে লুক্কায়িত তিক্ষ্ণ ছুরি খানি বাহির করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইলেন না, কারণ ইতিপূর্ব্বেই অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক ইহা অপহৃত হইয়াছিল। তিনি নিরাশ হইলেন।

তথা হইতে নদীর সৈকত ভূমি পরিস্ফুত ভাবে দৃষ্ট হইতেছিল। তিনি সেই দিকে চলিলেন। স্থানে স্থানে কুঞ্জ কাননের মধ্যস্থিত পুষ্প-বিথিকাগুলি দিক দিগন্তের শোভা বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছিল। চন্দনী চলিলেন—দ্রুতবেগে নদী তীরাভিমুখে চলিলেন যখন তিনি নদীর সৈকত ভূমিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন তখন তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বোধ করিতে লাগিলেন এবং ঘর্ম্মজলে তাঁহার বসনাদি অত্যধিক পরিমাণে সিক্ত হইতেছিল। তখনও সেই কল্লোলমুখরিত বেলাভূমি পশ্চিমাকাশস্থ রবির অপরিসীম আলোক সাগরে একেবারে ডুবিয়া যায় নাই। চন্দনী ঘর্ম্মাক্ত শরীরে একটি ছায়াযুক্ত স্থানে গিয়া উপবেশন করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন পাঁচজন অতিশয় বলিষ্ঠকায় ব্যক্তি তাঁহার কুড়ি হাত দূরে অবস্থান করিতেছে।

চন্দনী আশ্চর্য্য হইলেন ইতি পূর্ব্বে একজন বলিষ্ঠকায় পুরুষই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। অতিরিক্ত চারিজনের আগমন তাঁহার সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল এই সব দর্শন করিয়া তিনি ভালরূপেই বুঝিতে পারিলেন যে তিনি বন্ধন মুক্ত হইলেও এই লোকদিগের দ্বারা প্রকারান্তরে বন্দিনী হইয়াছেন। চন্দনী নদী সৈকতে উপবেশন পূর্ব্বক নীরব নিস্পন্দ হইয়া সময় যাপন করিতে লাগিলেন। পলাইবার একটুও চেষ্টা তাঁহার মনে উদয় হইল না। কারণ তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার পলাইবার চেষ্টা সম্যকরূপে বৃথা হইবে তিনি পলাইতে চেষ্টা করিলেই ঐ বলবান যুবকগুলি আসিয়া তাঁহাকে ধৃত করিবে। যখন সূর্য্যালোক সম্যকরূপে তেজপ্রাপ্ত হইল, বেলাস্থিত বালুকাগুলি উজ্জ্বল রজত খণ্ডের ন্যায় চক্‌চক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল, তখনও পর্য্যন্ত চন্দনী উপবিষ্টা রহিলেন একবারও উঠিলেন না অথবা পানাহারের চেষ্টা করিলেন না। চিন্তায় তখনও তাহার শরীর বহিয়া ঘর্ম্মজল পড়িতেছিল। এই ভাবে মধ্যাহ্ন অতীত হইল। সায়াহ্ন আসিতেছে তথাপি চন্দনীর চৈতন্য নাই। সম্পূর্ণ বিদেশ, অতি নির্জ্জন নদীর সৈকত, শত্রু কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা, সম্মুখে অন্ধকার রজনী, তিনি একাকিনী।

বামারচনা।

তুমি।

১

তুমি যে আমার জীবন কাননে
মধুর বসন্ত হেন,
তুমি যে আমার হৃদয়-গগনে।
শাঃদ চন্দ্রমা যেন।

২

তুমি যে আমার মরম বীণায়
উষার পূরবী তান।
তুমি যে আমার অন্তর রাজ
প্রাণের হরে প্রাণ।

৩

তুমি যে আমার নয়নে নষ্নন
লক্ষ্য পথে ধ্রুব তারা,
তুমি যে আমার হৃদয় আরাম
কিবা স্নিগ্ধ সুধা-ধারা!

৪

তুমি যে আমার সাধনার ধন
স্বর্গ, মোক্ষ, ধ্যান, জ্ঞান।
তোমারি মূরতি ধরিয়া হৃদয়ে
লভিব যে নিরবাণ।

"শিশির" রচয়িত্রী।

শশ্মান।

মরতের ধুলা খেলা এখানে ফুরায়।
মানবের দিন শেষে,
উপনীত হেথা এসে,
জীবন স্বপন সুখ যবে ভেঙ্গে যায়।
যবে দেহ অচেতন।
অবশ ইন্দ্রিয়গণ।
মায়ার দৃঢ় বন্ধন বাঁধেনা হিয়ায়।
ভবলীলা অবসানে,
সেই দিন এই স্থানে,
অন্তিম শয়ানে লভে অনন্ত নিদ্রায়,
লুকায় মানব নাম শশ্মান ছায়ায়।
কে বলে শশ্মান তুমি ভীষণ দর্শন।
উন্মুক্ত তোমার দ্বার।
অবারিত অনিবার।
পশিছে মানব নিত্য মুদিত নয়ন।
জীবনের শেষ দিনে,
ত্যজিয়া স্বজনগণে,
তোমার ভবনে করে আশ্রয় গ্রহন।
তুমি প্রিয় বন্ধুবর,
দিয়া সুস্থ কলেবর,
পাঠাও মানবে সেই শান্তি নিকেতন।
শশ্মান! তোমার মত বন্ধু কে এমন।
তুমি চির শান্তিময় সুখের আগার।
নাহি হেথা কোলাহল,
অশান্তির দাবানল,
নাহি হিংসা, অভিমান, মিছা অহঙ্কার।
নিস্তব্ধ নির্জ্জন স্থান,
কি শান্ত তোমার প্রাণ,
কি শান্ত হৃদয় তব অনন্ত উদার।
না থাক কুসুম বন,

না থাক সে সমীরণ,
না থাক ফুটন্ত ফুলে মধুপ ঝঙ্কার।
শ্মশান! তুমিই তব শোভার ভাণ্ডার।
থাকুনা শ্মশান মাঝে পিশাচের দল,
শৃগাল গৃধিনীগণ,
থাকুক না অগনন,
জুড়িয়া শ্মশান বক্ষ করি কোলাহল।
মানব গৃধিনী লয়ে,
সংসার শ্মশান চেয়ে,
শত গুণে ভাল এই শ্মশানের স্থল।
শ্মশান বিধৌত করি,
পতিতে হৃদয়ে ধরি,
জননী জাহ্নবী বহে পবিত্র নির্ম্মল।
কে বলে শ্মশান তুমি ভীষণ কেবল

শ্রীমতী উষা প্রমোদিনী বসু

পূর্ণিমা নিশিথে।

১

অয়ি হাসিভরা শশী,
অনন্ত গগন তলে,
আনন্দে যেতেছ ভাসি
কি পেয়ে ও হৃদিতলে?

২

এত হাসি হেসে কেন
সবারে ভুলাতে চাও?
কি পেয়ে মজেছে হিয়ে
কারে না বুঝিতে দাও?

৩

এই কি তোমার শশী,—
এই কি উচিত ভাই?
নিজে কি আনন্দে ভাস
কারে কি জানাতে নাই?

৪

বল শশী বল মোরে
নীরবে রয়েছ কেন?
আমারে জানায়ে কিগো
ব্যথিত হইবে প্রাণ?

৫

হেরিলে তোমার কায়
সকলি ভুলিয়া যাই,
মনে হয় এ জগতে
দুঃখ বলি কিছু নাই।

৬

চকোর চকোরি সদা
মিশিয়ে তোমার সনে,
কত সুখে ভাসে তারা
তোমারে লভিয়ে প্রাণে।

৭

শরতের শশী তোরে
ক্ষণেক হেরিতে গিয়ে,
জানি না কি ভাবে কোথা
হৃদি যায় মিশাইয়ে

৮

অনন্ত গগনে থাক
অনন্তের ভাবে মিশে,
আমার প্রাণের কথা
তুমি কি শুনিবে এসে?

৯
(এ) হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে
সবি তো লুকান আছে,
কাহারে বলি না যদি—
'পাগলিনী' বলে পাছে।

১০
তাই আজি মনে হয়
(তোরে) জানায়ে প্রাণের আশা,
কি আনন্দ পাব তায়—
লিখিতে নাহিক ভাষা।

১১
(তবে) তুমি যদি নাহি শুন
আর কারে নাহি ক'ব,
নীরবে এসেছি হেথা
নীরবেই স'য়ে র'ব।

১২
ইহাতেও এক বিন্দু
নাহি মোর দুঃখ লেশ,
(তবে) তোমার সৌন্দর্য্য হেরে
(যেন) এ জীবন হয় শেষ।

১৩
ইহা ছাড়া অন্য সাধ
আর কিছু নাহি চিতে,
(শুধু) তোমারি মতন যেন
পারি প্রেম বিলাইতে।

১৪
বল শশী দয়া করি
বড় অভাগিনী আমি,
শুধু এই পদ ছায়ে,
মোরে কি রাখিবে তুমি?

১৫
নাহি যদি রাখ কথা
চ'লে যাও পায়ে দ'লে,
(আমিতো) সহিতে এসেছি ভবে
সহিয়া যাব চ'লে।

১৬
কিছু যদি নাহি থাকে
আছে তো গো অশ্রু জল?
(কিন্তু) আমারে কাঁদায়ে শশী,
কিবা তব হবে ফল?

১৭
(আমি তো) কাঁদিতে এসেছি ভবে
কাঁদিয়া জনম যাবে,
আমাকে কাঁদায়ে শশী,
কিবা তব কল হবে?

১৮
আর মোর নাহি ভয়
কিবা ভয় অশ্রুজলে।
(এই) অশ্রুতে ফোটে যে ফুল
নিভৃতে হৃদয় তলে।

১৯
তাই সদা অশ্রুজল
বড় ভালবাসি আমি,
কেন যে বেসেছি ভাল,
সবি তো গো জান তুমি।

২০
অশ্রু মোর চির বন্ধু
তাই যেন বাসি ভালো,
ফেলিতে ফেলিতে অশ্রু
(যেন) হৃদে জাগে তব আলো।

২১
(আজি) তায় কিছু নাহি সাধ
আর কিছু নাহি চিতে,
(শুধু) তোমারি মতন যেন
পারি 'প্রেম' বিলাইতে।

শ্রীপ্রি।

৩৭ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩০নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা

No. 625. September, 1915.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৩ বর্ষ। ৬২৫ সংখ্যা।	ভাদ্র, ১৩২২। সেপ্টেম্বর, ১৯১৫।	১০ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

প্রার্থনা।

হে সর্ব্বলোক-মহেশ্বর-অখিল-বিধাতা! তুমি চিরকালের পিতা-মাতা ও রক্ষাকর্ত্তা। তোমার প্রসাদে এই সুদীর্ঘকাল সঙ্কটময় পথ অতিক্রান্ত হইয়াছে। ৫২ বৎসর পর্য্যন্ত তোমারই আশ্রয়ে এ প্রাণ রক্ষিত হইয়াছে; ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা-সহকারে তোমাকে প্রণিপাত করিতেছি এবং তোমার হস্তে জীবন সমর্পণ করিতেছি। তুমি মাতার ন্যায় সর্ব্বদা রক্ষা কর, সকল প্রকার শ্রীসৌন্দর্য্যে ও মহৎ গুণে বিভূষিত কর। হে বিশ্ববিধাতঃ, তোমার চরণে এই প্রার্থনা।

ওঁ ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ইষ্ট-লিন।*

প্রথম পরিচ্ছেদ।

লেডী ইজাবেল।

একখানি আরাম কেদেরায় মাউণ্ট-সাভারিণের আর্ল, উইলিয়াম তাঁহার নগরস্থিত বাটীর সুসজ্জিত পুস্তকাগারে বসিয়াছিলেন। তাঁহার কেশগুলি সমস্ত শুভ্র, ললাটস্থ চর্ম্ম সকল কুঞ্চিত হওয়ায় মুখখানি অত্যন্ত মলিন দেখাইতে ছিল। তাঁহার একখানি পা কাপড় দিয়া জড়ান, সেই পাখানি একটি ভেলভেটের আসনের উপর স্থাপিত ছিল, তাঁহার ঐ পাখানিতে বাত আশ্রয় করিয়াছে বলিতেন। তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় যে তিনি অকাল বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাস্তবিক

* মিসেস হেনরী উডের রচিত "ইষ্টলিন নামক উপন্যাস অবলম্বনে লিখিত।